Shopneel.tk

প্রবাল দ্বীপ

--রবার্ট ব্যালান্টাইন

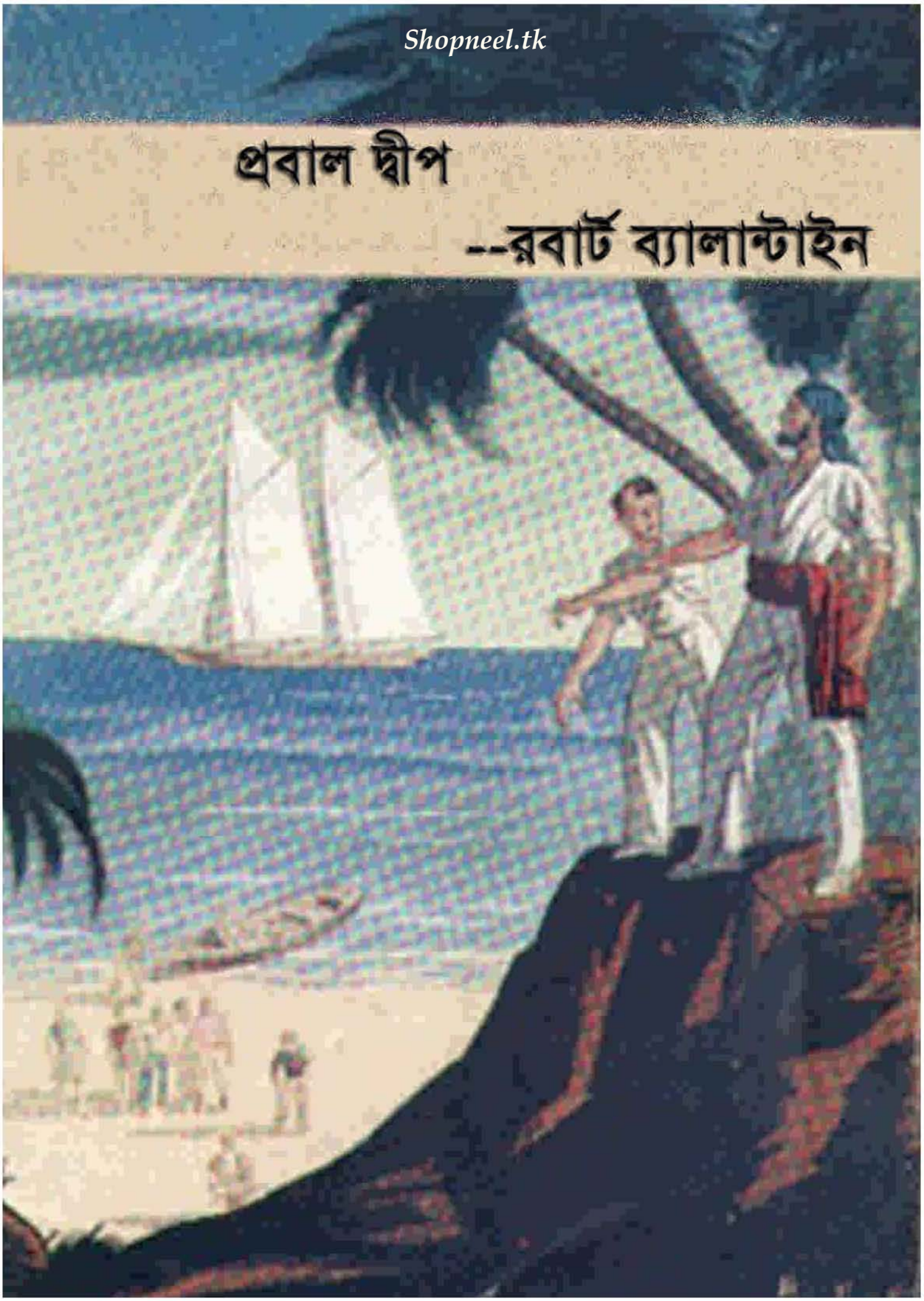

প্রবাল দ্বীপ

রবার্ট মাইকেল ব্যালান্টাইন

রূপান্তর :

রকিব হাসান

এক

পরিবারের সবাই সাগর ভালোবাসি আমরা। বাবা ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, দাদা ক্যাপ্টেন, তাঁর বাবা অ্যাডমিরাল। মায়ের বাবা ছিলেন জাহাজের মিডশিপম্যান। সে জন্য কথা, রক্তেই আমার সাগরের নেশা।

বাবার সঙ্গে প্রায়ই দীর্ঘ সাগর ভ্রমণে যেতো মা। সাগরের প্রতি গভীর ভালোবাসা নিয়ে জাহাজে জন্ম হয়েছে আমার, মধ্য আটলান্টিকে, ঝঞ্ঝাবহ এক ঝড়ের রাতে। আমার জন্মের পর পরই কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন বাবা।

ছোট বেলা থেকেই সাগর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, ঘুরে বেড়াই সাগরের কূলে কূলে। আমার নাম রালফ। ভবঘুরে প্রকৃতি দেখে বন্ধুরা রোভার নামে ডাকতে শুরু করলো। টিকে গেল নামটা। ওদের কাছে হয়ে গেলাম রালফ রোভার।

কিসে আমার আকর্ষণ বুঝতে পারলেন বাবা। তাই এগারো বছর বয়েসেই তুলে দিলেন উপকূলের কাছাকাছি চলাচল করে

এমন এক জাহাজে। কেবিন বয়ের চাকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাগরে।

ভালোই কাটে দিন। অবসর সময়ে বুড়ো নাবিকদের মুখে গল্প শুনি। জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা বলে তারা। দূর সাগরে অভিযানের গল্প শোনায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনি, কিভাবে প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে এসেছে তারা, রক্ষা পেয়েছে ভয়ংকর বিপদ থেকে, দেখেছে কতো বিচিত্র দেশ আর তার আধিবাসীদের। সব চেয়ে ভালো লাগে আমার প্রবাল দ্বীপের কাহিনী, ক্ষুদে প্রবাল কীটের অসামান্য ক্ষমতার কথা শুনে থ হয়ে যাই। দক্ষিণ সাগরের সেসব দ্বীপে নাকি চিরগ্রীষ্ম বিরাজ করে, আবহাওয়া মনোরম। বিচিত্র সব গাছ-গাছালিতে ভরা দ্বীপগুলো। বছরের সব সময়েই পাওয়া যায় সুস্বাদু ফল। অনেক দ্বীপেই মানুষ বাস করে। তাদের বেশির ভাগই হিংস্র, নরখাদক। নাবিকদের মুখে এসব গল্প শুনতে শুনতে ঠিক করে ফেললাম, সুযোগ পেলেই পাড়ি জমাবো দক্ষিণ সাগরে। নিজের চোখে দেখে আসবো প্রবাল দ্বীপ।

পনেরো বছর বয়েস হলো। যথেষ্ট বড় হয়েছি ভেবে, দূর সাগরে বেরোনোর ইচ্ছেটা প্রকাশ করে ফেললাম বাবা-মার কাছে। প্রথমে রাজি হলো না।

চাপাচাপি শুরু করলাম।

'আরো দু-এক বছর যাক না, তারপর যাস,' বললো মা।

অপেক্ষা করতে চাইলাম না মোটেই। গোঁ ধরে রইলাম।

অনেক বলে-কয়ে শেষে রাজি করিয়ে ফেললাম বাবাকে। তাঁর এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন আমাকে। পুরোনো বন্ধু, দক্ষ নাবিক, 'অ্যারো' নামের একটা সদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন। কথাবার্তা বললেন। তাঁর হাতেই আমাকে তুলে দেবেন ঠিক করলেন বাবা।

যাবার দিনে সজল চোখে মা বললো, 'রালফ, আমরা বুড়ো হয়েছি। বেশিদিন আর বাঁচবো না। যতো তাড়াতাড়ি পারিস, ফিরে আসিস বাপ।' আমার হাতে একখানা বাইবেল তুলে দিয়ে রোজ একবার করে পড়তে বললো। সব সময় ঈশ্বরকে স্মরণ রাখতে বললো।

জাহাজে চড়লাম। খুশিতে নেচে উঠলো মন। অবশেষে আমার ইচ্ছে পূরণ হতে চলেছে। পাড়ি জমাতে যাচ্ছি প্রবাল দ্বীপের উদ্দেশ্যে।

দুই

সুন্দর রোদ ঝলমলে এক দিনে ছাড়লো আরো। গন্তব্য : দক্ষিণ সাগর।

ডেকে দাঁড়িয়ে আছি। শেষ নোঙরটা তুলছে নাবিকেরা। দরাজ গলায় গান ধরেছে। আমার মনেও গান। ফিরে দাঁড়ালাম। আলাপ করতে চললাম বন্ধুদের সঙ্গে।

আমার মতো ছেলেছোকরা আরো আছে জাহাজে। তবে সবচেয়ে ভালো লাগলো জ্যাক মার্টিন আর পিটারকিন গে-কে। গে ওর আসল নাম, না ডাকনাম, জানি না। তবে নামটা বেশ মানানসই হয়েছে ওর জন্যে। হাসিখুশি, সুযোগ পেলেই কৌতুক করার জন্যে মুখিয়ে আছে। বয়স আমার চেয়ে বছর-খানেক কমই হবে। পিটারকিনের উল্টো জ্যাক। শান্ত, কথা বলে কম। সুন্দর, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। দু'চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। বয়েস আঠারো।

জাহাজে উঠেই সাক্ষাৎ হয়েছে জ্যাকের সঙ্গে। যেচে এসে পরিচয় করেছে। যেন কতোদিনের চেনা এমনিভাবে কাঁধে চাপড় দিয়ে বলেছে, 'হ্যালো, খোকা, এসো এসো, তোমার

শোবার জায়গা দেখিয়ে দিই।' আমাকে নিয়ে সিড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে বলেছে, 'তোমাকে দেখেই ভালো লেগে গেছে আমার।'

খুব তাড়াতাড়ি একে অন্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম আমরা : আমি, জ্যাক আর পিটারকিন। তারপর তিনজনে মিলে যা একখান অ্যাডভেঞ্চার করেছি না। ···খুলেই বলি সব···

যাত্রার প্রথম দিকে বেশ ভালোই কাটলো, তবে বলার মতো তেমন কিছু ঘটলো না। কেপ হর্নের দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। কেমন যেন ভীত হয়ে উঠলো নাবিকেরা। খালি ঝড়তুফানের কথা বলে। ওই কেপ নাকি খুব বিপজ্জনক জায়গা।

কেপ হর্নে পৌঁছে গেলো জাহাজ। উত্তাল এখানে সাগর, বড় বড় ঢেউ। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো। ঝড় এলো না। নিরাপদেই পেরিয়ে এলাম জায়গাটা। পৌঁছে গেলাম প্রশান্ত মহাসাগরে। উষ্ণ ঝিরঝিরে কোমল হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল মন-প্রাণ।

অবশেষে প্রবাল দ্বীপের দেখা পাওয়া গেল। কি যে ভালো লাগলো বলে বোঝাতে পারবো না। জ্যাক আর পিটারকিনও চেয়ে আছে দ্বীপের দিকে। চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। ধবধবে সাদা সৈকতের ওপারে সবুজ পাম গাছের সারি। গাঢ় নীল সাগর আর আকাশের পটভূমিতে ছবির মতো ফুটে আছে। আমার মনে হলো; স্বপ্ন দেখছি। এতো সুন্দর জায়গা আছে পৃথিবীতে!

হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে আমাকে দ্বীপটা। ইচ্ছে হলো, উড়ে চলে যাই। চিরদিনের জন্যে গিয়ে বাসা বাঁধি ওখানে।

শিগগিরই পূরণ হলো আমার বাসনা।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে জাহাজ। এক রাতে উঠলো প্রবল ঝড়। বাতাসের প্রথম তোড়েই উড়ে গেলো দুটো প্রধান মাস্তুল। সামনের ছোট মাস্তুলটা দাঁড়িয়ে রইলো কোনোমতে।

একনাগাড়ে পাঁচ দিন পাঁচ রাত বইলো প্রচণ্ড ঝড়। ছোট নৌকাটা ছাড়া ডেকের ওপরে আর কিছুই রইলো না, ধুয়েমুছে সব নিয়ে চলে গেল ঢেউ। পথ হারালো জাহাজ। কোথায় আছে এখন, বলতে পারলেন না ক্যাপ্টেন।

ছয় দিনের দিন, দুপুরের আগে সামনে ডাঙা চোখে পড়লো। একটা দ্বীপ, প্রবালের দেয়াল ঘিরে রেখেছে। দেয়ালের ঘেরের মধ্যে ল্যাগুনে পানি শান্ত···ওখানে কি পৌঁছাতে পারবো কোনোভাবে? বাতাসের তেজ কমেনি এক বিন্দু। দেয়ালের এক জায়গায় সরু একটা ফাটল দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন, ওপথেই জাহাজ ঢোকানোর চেষ্টা করলেন তিনি। ফাটলের কাছে পৌঁছে গেছে জাহাজ, ভেতরে ঢুকতে যাবে, এই সময় এসে আছড়ে পড়লো এক বিশাল ঢেউ। ভেঙে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল হাল-টাকে। চরকির মতো পাক খেতে লাগলো জাহাজ। বাতাস আর ঢেউয়ের খেলায় ব্যস্ত হয়ে গেল।

'নৌকা নামাও!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

নীরবে আদেশ পালন করলো নাবিকেরা। কি ভয়ানক বিপদে পড়েছে, বুঝতে পারছে।

ফুঁসে ওঠা ওই সাগরে ছোট্ট একটা নৌকা কতোখানি কি সাহায্য করতে পারবে, বুঝতে পারলাম না!

'রালফ, পিটারকিন,' বললো জ্যাক, 'আমার কাছাকাছি থাকবে। কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। ওই নৌকা আধ মিনিটও টিকবে না, উল্টে যাবে। তার চেয়ে একটা দাঁড় আঁকড়ে ভেসে থাকা অনেক ভালো। ঢেউয়ের ধাক্কায় হয়তো দেয়ালের ভেতরে গিয়ে পড়বো, বেঁচে যাবো! কি বলো? থাকবে আমার সঙ্গে?'

'থাকবো!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম আমি আর পিটারকিন।

বুঝতে পারছি, বাঁচার আশা নেই। বিশাল ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে, বজ্রের গর্জন তুলে ভাঙছে। মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি।

সরে গিয়েছিলো, আবার দেয়ালের কাছাকাছি চলে এলো অ্যারো। যে কোনো মুহূর্তে বাড়ি লেগে চুরমার হয়ে যেতে পারে। নৌকা নামাচ্ছে নাবিকেরা। হুকুমের পর হুকুম দিয়ে চলেছেন ক্যাপ্টেন। ওই মুহূর্তে ডেকের উপর এসে আছড়ে পড়লো পাহাড় প্রমাণ এক ভয়াল ঢেউ। প্রবাল প্রাচীরের দেয়ালের গায়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেললো জাহাজটাকে। মড়াৎ করে ভেঙে পড়লো অবশিষ্ট মাস্তুলটা। পড়লো নৌকাটার

ওপর। কয়েকজন নাবিক আর নৌকা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে।

আগেই একটা দাঁড় বেছে রেখেছে জ্যাক। পাগলের মতো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওটা, আমি আর পিটারকিন। মাস্তুলের ছেঁড়া দড়িতে পেঁচিয়ে আটকে আছে ওটা। এতো গোলমালের মাঝেও কি করে জানি একটা কুড়াল জোগাড় করে নিয়ে এলো জ্যাক। কোপ মারলো। ভীষণ দুলছে জাহাজ। কোপ দড়িতে না লেগে লাগলো দাঁড়ের গায়ে। গভীর হয়ে বসে গেল কুড়ালের ফলা। টানাহেঁচড়া করেও ছাড়াতে পারলো না সে। এই সময় আবার একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো জাহাজের গায়ে। পটাপট ছিঁড়ে গেল দড়ি, মুক্ত হয়ে গেল দাঁড়। চোখের পলকে দাঁড়টা আঁকড়ে ধরলো জ্যাক। পর মুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করলাম সাগরে, ঢেউয়ের মাথায়। আরেকটা মুহূর্ত। তারপরই মনে হলো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে। কঠিন কোন কিছুতে বাড়ি খেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরলো। নরম ঘাসের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছি। মাথার উপরে ছাতের কার্নিশের মতো ঝুলে আছে এক বিরাট পাথর। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে পিটারকিন। ভেজা রুমাল দিয়ে কপাল মুছে দিচ্ছে। কপালের চামড়া কেটে রক্ত বেরোচ্ছে আমার, বন্ধ করতে চাইছে।

তিন

ধীরে ধীরে মাথা কাত করে তাকালাম এদিক ওদিক। ভয়ানক যন্ত্রণা করে উঠলো মাথার ভেতরে, আপনা আপনি বুজে গেল চোখের পাতা।

'রালফ! রালফ! কেমন লাগছে এখন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো পিটারকিন।

'কথা বলো, রালফ!' শুনতে পেলাম জ্যাকের নরম গলা। 'কেমন লাগছে এখন?'

আবার চোখ মেললাম। মুখের উপর ঝুঁকে আছে জ্যাকের মুখ। দু'চোখে উদ্বেগ।

উঠে বসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু উঠতে দিলো না জ্যাক।

'শুয়ে থাকো,' বললো জ্যাক। 'শরীর দুর্বল। নাও, এই পানিটুকু খেয়ে ফেলো। কাছেই একটা ঝর্না আছে। ওখান থেকে এনেছি।' টুপিতে করে আনা পানি আমার হাঁ করা মুখে ঢেলে দিলো সে ধীরে ধীরে।

কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু জ্যাক থামিয়ে দিলো আমাকে। 'এখন কোন কথা নয়। সব বলবো পরে। জিরিয়ে

নাও আগে।'

'কিছুই মনে করতে পারছি না আমি!' দুর্বল গলায় বিড়বিড় করলাম।

'ঠিক আছে, সব বলছি। তবে তুমি কোনো কথা বলবে না। চুপচাপ শুনে যাও,' বললো জ্যাক। 'ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে গিয়েছিলাম সাগরে, এটুকু তো মনে করতে পারছো? বেশ। দাঁড়টা শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারোনি। ওটার বাড়িই লেগেছে কপালে···দাঁড় থেকে হাত ছুটে গিয়েছিলো, পিটারকিনের গলা জড়িয়ে ধরেছিলে···'

'আরেকটু হলেই দম বন্ধ করে মেরে ফেলেছিলে আমাকে,' কথার মাঝেই বলে উঠলো পিটারকিন।

হেসে উঠলো জ্যাক। 'ঠিক। আমি তো ভেবেছিলাম, মেরেই ফেলেছে। শেষে দেখলাম, দাঁড় আঁকড়ে আছে পিটারকিন, ছাড়ছে না। মরেনি। দাঁড়টা সহ তোমাদেরকে ঠেলে নিয়ে এলাম তীরে।···না না, তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার ছিলো না। ঢেউ প্রায় উড়িয়ে নিয়ে এসেছিলো আমাদেরকে ল্যাগুনের ভেতরে···ওখানে পানি শান্ত।'

'ক্যাপ্টেনের কি অবস্থা? নাবিকেরা?' জানতে চাইলাম।

'জানি না,' বললো জ্যাক। 'ঢেউ সরে যেতেই ভেসে উঠলো নৌকাটা। ওতে চড়ে বসলো ক্যাপ্টেন আর কয়েকজন নাবিক। ছোটো একটা পালমতোও টাঙালো—ওই কম্বল-টম্বল দিয়ে হবে হয়তো। জোর বাতাসের ধাক্কায় ছুটে চলে

গেল নৌকাটা। মাঝ সাগরে চলে গেছে হয়তো এখন!'

'বাঁচতে পারবে?' উৎকণ্ঠা চাপা দিতে পারলাম না।

'হয়তো পারবে,' শান্ত কণ্ঠে বললো জ্যাক। 'আশেপাশে অনেক দ্বীপ আছে। ওগুলোর কোনোটায় উঠে যেতে পারলেই...'

'আমারও তাই ধারণা,' বলে উঠলো পিটারকিন। 'বাঁচবে ওরা। কিন্তু আমাদের কি হবে? জ্যাকের দিকে ফিরলো। 'একটু আগে জাহাজটা দেখতে গিয়েছিলে। কি অবস্থায় আছে?'

'তলিয়ে গেছে।'

চুপ হয়ে গেল পিটারকিন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। ভাবছি। জাহাজটা ডুবে না গেলে যন্ত্রপাতি কিছু পাওয়া যেতো। খাবার আর দরকারী অন্যান্য জিনিসও পেতাম। এখন কিছুই নেই আমাদের কাছে, কিচ্ছু না। দ্বীপে সভ্য মানুষ আছে কিনা কে জানে। না থাকলে গেছি। না খেয়ে মরবো। কে জানে, হয়তো তার আগেই ধরে আমাদের পুড়িয়ে খাবে মানুষখেকো জংলীরা। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তারমানে গেছি আমরা!'

'এখনো কিছুই বলা যায় না,' বললো জ্যাক। 'এখানে কি আছে না আছে এখনো জানি না আমরা।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো পিটারকিন। হয়তো অনেক বড় অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। হয়তো রবিন-

সন ক্রুসোর মতোই বাস করবো আমরা এখানে। ধরে নিতে পারি, এখন এই দ্বীপ আমাদের। জ্যাক, তোমাকে রাজা নির্বাচন করলাম। রালফ, প্রধানমন্ত্রী। আর আমি···'

বাধা দিয়ে বললো জ্যাক, 'হাসিঠাট্টা করার সময় এটা নয়, পিটারকিন। ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে এখন। কপালে কি আছে, জানি না। এই দ্বীপে সভ্য মানুষ না থাকলে বুনো জানোয়ারের মতো বাঁচতে হবে আমাদের। কারণ, কোনো বস্ত্রপাতি নেই সঙ্গে। এমন কি একটা ছুরিও না।'

'না না আছে, আছে!' চেঁচিয়ে উঠলো পিটারকিন। 'দেখো!' বলতে বলতেই পকেট থেকে ছুরিটা বের করে আনলো। ক্ষুদে একটা পেন-নাইফ, তা-ও ফলার মাথা ভাঙা।

'হ্যাঁ, নেই মানার চেয়ে কানা মামা ভালো,' বললো জ্যাক। 'কিন্তু বসে থাকলে চলবে না। এসো, কাজ করতে করতে কথা বলি। কোথায় কি অবস্থায় আছি, জানা দরকার। যেভাবেই হোক, বেঁচে থাকতে হবে! তারপর দেখা যাবে, কতোখানি কি করা যায়।'

চার

প্রথমেই, সঙ্গে কি কি আছে তার হিসেব করতে বসলাম।

যার যার পকেট হাতড়ে যা পেলাম, বের করে সব রাখলাম একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর।

আছে : ক্ষুদে একটা পেন-নাইফ—মরচে ধরা, মাথা ভাঙা, একটা তামার পুরোনো পেন্সিল—ভেতরে শিষ নেই, ছয় গজ লম্বা এক টুকরো সরু দড়ি, একটা পাল সেলাই করার সুচ, একটা ছোট টেলিস্কোপ। এছাড়া জ্যাকের কড়ে আঙুলে একটা তামার আঙটি, পরনের কাপড়চোপড় আর তিনজনের তিনটে রুমাল।

এগুলো কোনো জিনিসই হলো না, আমি বলতে চাইছি, সত্যিকারের কাজের জিনিস। কিন্তু কি করবো? প্রাণটা যে বেঁচে আছে, এতেই আপাতত খুশি থাকতে হচ্ছে।

আমাদের কাছে জিনিসপত্র যা আছে, সেগুলো কি কাজে লাগতে পারে, সে পরামর্শ করছি, এই সময় চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক। 'দাঁড়! দাঁড়টার কথা ভুলেই গেছি আমরা!'

'বাদ দাও,' বললো পিটারকিন। 'দ্বীপে প্রচুর গাছপালা

আছে। দশ হাজার দাঁড় বানানো যাবে।'

'তা যাবে,' স্বীকার করলো জ্যাক। 'কিন্তু দাঁড়টার মাথায় লোহার পাত লাগানো আছে। ওই লোহাটুকু কাজে লাগতে পারে আমাদের। চলো, দেখি।'

উঠলাম। তাড়াতাড়ি পা চালালাম সৈকতের দিকে। আমার মাথা ঘুরছে। সঙ্গীদের সঙ্গে সমান তালে হাঁটতে পারছি না। শেষে আমাকে ধরে ধরে হাঁটতে লাগলো জ্যাক। আগে আগে প্রায় দৌড়ে চললো পিটারকিন।

চলতে চলতেই চারপাশে তাকালাম। যতোই দেখছি, খুশি হয়ে উঠছে মন। টিলাটক্কর আর পাহাড়ের ঢালে, উপত্যকায় জন্মে আছে সুন্দর গাছপালা আর ঝোপঝাড়। নারকেল ছাড়া আর একটা গাছও চিনতে পারলাম না। জ্যান্ত নারকেল গাছও এই প্রথম দেখলাম। এর আগে দেখেছি শুধু ছবিতে।

হঠাৎ শোনা গেল পিটারকিনের চিৎকার : 'জলদি! জলদি এসো! দেখে যাও!'

বানরের মতো লাফাচ্ছে পিটারকিন। সৈকতে পড়ে থাকা কিছু একটার দিকে চেয়ে আছে।

'সব কিছুতেই মজা পায় ও! আশ্চর্য ছেলে!' বললো জ্যাক। আমার হাত ধরে টান দিলো। 'তাড়াতাড়ি এসো তো। দেখি, কি দেখে এতো খুশি ও!'

কাছে চলে এলাম। লাফানো থেমে গেছে পিটারকিনের। নিচু হয়ে কিছু একটা ধরে টানছে। আরো এগিয়ে দেখলাম,

দাঁড়ের গায়ে গেঁথে আছে এখনো কুড়ালটা। যেটা দিয়ে দড়ি কাটার চেষ্টা করেছিলো জ্যাক। এতোই শক্ত হয়ে গেঁথেছে, ঢেউয়ের আঘাতেও খুলে পড়ে যায়নি।'

'দারুণ! চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল ও। পিটারকিনকে বললো, 'দেখি, সরো, আমি খুলছি!'

দাঁড়টা পা দিয়ে চেপে ধরলো জ্যাক। তারপর কুড়ালের হাতল ধরে দিলো হ্যাঁচকা টান। খুলে এলো কুড়াল।

'এটা,' হাতে নিয়ে কুড়ালটা দেখতে দেখতে বললো জ্যাক, 'হাজারটা ছুরির চেয়েও বেশি কাজ দেবে। ফলাটা দেখেছো? কি রকম চকচকে আর কি ধার!'

কুড়াল আর দাঁড়টা নিয়ে আবার আগের জায়গায় চলে এলাম আমরা। যেখানে পাথরের ওপর জিনিসপত্রগুলো ফেলে রেখে গিয়েছিলাম।

'চলো, জাহাজটা যেখানে ডুবেছে, সেখানে যাই এখন,' প্রস্তাব দিলো জ্যাক। 'হয়তো আরো কিছু পেয়ে যেতে পারি ওখানে।'

গেলাম। শাদা বালিতে ঢাকা সৈকত পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম পানির ধারে। খানিক দূরেই প্রবালের দেয়াল। ওতেই ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেছে জাহাজ। না, কিচ্ছু পেলাম না। কিছুই ভেসে নেই পানিতে। সৈকতে এসে পড়েনি কোনো কিছু।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। ক্যাম্পে ফিরে চললাম। ক্যাম্প

মানে, যেখানে পাথরের ওপরে রেখে এসেছি জিনিসপত্রগুলো। তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাতাওয়ালা ডাল কেটে নিলাম। খুঁটিরও অভাব নেই। রাত কাটানোর মতো একটা আচ্ছাদন তৈরি করে নিতে দেরি হলো না।

এই সময়ই মনে হলো, আলো কিংবা আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা নেই। বিমূঢ়ের মতো একে অন্যের দিকে তাকালাম।

'জ্যাক, এখন কি করি!' হতাশ গলায় বললাম। ইতি-মধ্যেই জ্যাকের ওপর নির্ভর করতে আরম্ভ করেছি আমি আর পিটারকিন। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি, ও-ই আমাদের নেতা।

কোনো জবাব দিতে পারলো না জ্যাক। সে-ও বোকা হয়ে গেছে। আগুনের কথা এর আগে আমাদের মতো তারও মনে আসেনি। তবে হাত গুটিয়ে বসে রইলো না। কিছু শুকনো লতাপাতা জোগাড় করে এক জায়গায় জড়ো করলো। দুটো পাথর নিয়ে ঘষে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা চালালো। বৃথা। শেষে, কুড়ালের পেছন দিকে পাথর ঘষে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করলো। বিফল হলো এবারও।

হতাশ হয়ে পড়লাম। আগুন ছাড়া চলবো কি করে! করুণ হয়ে উঠেছে পিটারকিনের চেহারা।

'ভাইরে!' বললো পিটারকিন। 'খাবার কাঁচা খেতে আপত্তি নেই। কিন্তু কি খাচ্ছি, না দেখে খাই কি করে!'

'পেয়েছি!' পিটারকিনের কথায় কান না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক। 'আইডিয়া একটা এসেছে মাথায়!'

উঠে পড়লো জ্যাক। কাছেই একটা গাছ। একটা ডাল কেটে নিলো সে। ছোটো ছোটো ডালপাতা সব ছেটে ফেলে দিলো। ফিরে এসে বললো, 'এভাবে আগুন জ্বালাতে দেখেছি আমি। পিটারকিন, দড়িটা দাও।'

ডালের দু'মাথায় দড়ি বেঁধে ধনুক বানিয়ে ফেললো জ্যাক। একটা শুকনো ডাল জোগাড় করলো। সরু ডালের এক মাথার ইঞ্চি ছয়েক কেটে নিয়ে ধনুকের দড়িতে আটকালো। এক প্যাঁচ দিয়ে এমনভাবে আটকালো কাঠিটা, ঘোরালে দড়িতে আটকে থেকেই এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে যায়। জিনিসটা অনেকটা কাঠমিস্ত্রির হাতে-চালানো তুরপুণের মতো। শুকনো ডাল কেটে কাঠের দুটো চাকতি বানালো জ্যাক। একটা চাকতি মাটিতে রেখে তার ওপর শুকনো লতাপাতা ফেললো। ধনুকে আটকানো কাঠির একটা মাথা চেপে বসালো তার ওপর। অন্য মাথা দিয়ে নিজের বুকে ঠেসে ধরলো আরেকটা চাকতি। এইবার তুরপুণ চালানোর মতো করে ধনুকটা আগেপিছে করতে লাগলো, জোরে জোরে। কাঠের সঙ্গে কাঠির ঘষায় প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হলো, ধোঁয়া উঠতে লাগলো শুকনো লতা-পাতা থেকে। হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম আমি আর পিটারকিন।

আগুন জ্বললো বটে, কিন্তু পুড়িয়ে খাবার মতো কিছু নেই। আশেপাশে অনেক নারকেল গাছ, প্রচুর নারকেল পড়ে আছে মাটিতে। পিটারকিনকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গেল জ্যাক। কয়েকটা

নারকেল নিয়ে ফিরে এলো। কাঁচা এবং শুকনো, দু'রকমেরই।

একটা কাঁচা নারকেল তুলে নিলো জ্যাক। কুড়াল দিয়ে কেটে ফেললো নিচের চোখা অংশটুকু। ভাঙা ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিতেই ছিটকে বেরোলো পানি। একটা ছেঁদা করে ফেলে নারকেলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। 'নাও, খেয়ে দেখো। কাঁচা নারকেল, ডাব বলে।'

'তুমি জানলে কি করে?' নারকেলটা নিয়ে বললাম।

'বই পড়ে।'

আগুনের পাশে বসে চমৎকার খাওয়া হলো। ডাবের পানি আর শুকনো নারকেল। পেট ভরতেই চেপে ধরলো এসে ভীষণ ক্লান্তি। ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখের পাতা। গত ছয় দিন ছয় রাত ঘুমোতে পারিনি।

মরার মতো ঘুমোলাম সেরাতে।

পাঁচ

সুন্দর এক সকাল। সোনালি রোদ। নারকেল পাতার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে গাঢ় নীল আকাশ। পরিষ্কার। এক রত্তি মেঘ নেই।

সবে ঘুম ভেঙেছে আমার। চিত হয়ে শুয়ে আছি পাতার বিছানায়। ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়লো ছোট্ট সবুজ টিয়েটা। পিটারকিনের মাথার করেক ইঞ্চি ওপরে খুঁটির ডালে বসে আছে। ঘাড় কাত করে তাকাচ্ছে একবার এপাশের চোখ দিয়ে, একবার ওপাশের। এতো মনোযোগ দিয়ে কি দেখছে পাখিটা! পিটারকিনের দিকে চোখ ফেরালাম। ও, এই ব্যাপার! হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে পিটারকিন। ওর মুখের ভেতরটা তাজ্জব হয়ে দেখছে টিয়ে।

পিচিক করে যদি এখন মলত্যাগ করে টিয়েটা, পড়বে গিয়ে পিটারকিনের একেবারে মুখের ভেতর! কথাটা মনে পড়তেই হো হো করে হেসে উঠলাম। ভড়কে গিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো টিয়ে। চমকে চোখ মেললো পিটারকিন। আঁতকে উঠে উড়ে চলে গেল পাখিটা।

'দুষ্টু পাখি!' নারিকেল গাছে গিয়ে বসা টিয়েটার উদ্দেশ্যে মুঠো পাকালো পিটারকিন। হাই তুললো। চোখ রগড়ালো।

'কটা বাজে?' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো পিটারকিন।

'কি জানি! ঘড়িগুলো তো সব পানির তলায়,' বললাম। 'সূর্য উঠেছে খানিক আগে, এটুকুই বলতে পারি।'

ধীরে ধীরে মনে পড়লো যেন পিটারকিনের, কোথায় রয়েছে। তাকালো সবুজ গাছপালা, নীল আকাশের দিকে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চোখে পড়লো রোদ ঝলমলে নীল সাগর।

চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ পিটারকিন। বেরিয়ে গেল পাতার আচ্ছাদনের তলা থেকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো গায়ের সব জামাকাপড়। তারপর ছুটলো শাদা সৈকতের দিকে।

চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে জ্যাকের। উঠে বসে চারদিকে তাকালো, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। কোন অঘটন ঘটেনি বুঝতে পেরে সে-ও বেরোলো। পিটারকিনের মতোই জামাকাপড় খুলে ফেলে ছুট লাগালো।

আমিই বা চুপ করে থাকি কেন? অনুসরণ করলাম বন্ধুদের। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দু'বার হোঁচট খেলাম পাথরে, আছাড় খেলাম। চেঁচিয়ে আমাকে হুঁশিয়ার করলো পিটারকিন।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে। এখানে আমি পিটারকিনের চেয়ে অনেক ভালো। খুব ভালো সাঁতার জানি। আর ও পারে না বললেই চলে। তবে আমাদের মাঝে সব চেয়ে ভালো সাঁতারু জ্যাক। বিশেষ করে ডুবসাঁতারে তার জুড়ি খুব কমই আছে।

অগভীর পানিতে দাঁড়িয়ে ছটোপুটি ঝাপাঝাপি করতে লাগলো পিটারকিন। আমি আর জ্যাক সাঁতরে চলে এলাম গভীর পানিতে। পুকুরের মতোই শান্ত ল্যাগুনের পানি। কাচের মতো পরিষ্কার। নিচে কি আছে স্পষ্ট দেখা যায়। অথচ পানি এখানে ত্রিশ ফুট গভীর।

প্রায় একই সঙ্গে ডুব দিলাম আমি আর জ্যাক। চলে এলাম তলায়। পানির নিচে এক অপূর্ব বাগান। ঝকঝকে শাদা বালি। বিচিত্র সব সামুদ্রিক আগাছা, মাঝে মাঝে জন্মে আছে লাল-শাদা প্রবালের ঝাড়। ঝাড়গুলোর ভেতর দিয়ে গজিয়ে উঠেছে এক জাতের রঙিন শেওলা। ওগুলোর ভেতরে ঢুকে বসে আছে ছোটো ছোটো রঙিন মাছ, লাল নীল সবুজ হলুদ, সব রঙের। রঙিন গাছে রঙিন ফুলের মতো লাগছে দেখতে। হাত দিয়ে নাড়া দিলেই সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসছে মাছ, চট করে আবার ঢুকে পড়ছে আরেকটা ঝাড়ের ভেতর। লুকাচ্ছে না। রঙিন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। মোটেই ভয় পাচ্ছে না।

দম ফুরিয়ে এলো। ওপরে উঠে এলাম দুজনে।

'এর আগে এতো সুন্দর বাগান দেখেছো!' দম নিতে নিতে বললো জ্যাক।

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লাম। 'এতো এক পরীর রাজ্য! স্বপ্নে দেখেছি মনে হয়!'

'চলো তাহলে, আরেকবার স্বপ্ন দেখে আসি,' বলেই ডুব দিলো জ্যাক।

আমিও ডুব দিলাম।

চোখ ভরে দেখছি সে অপরূপ দৃশ্য। পাথর আর শেওলার ফাঁকে ফাঁকে ঝিনুক কুড়াচ্ছে জ্যাক। খোঁজার দরকার হয় না। শেওলা সরালেই চোখে পড়ছে অসংখ্য ঝিনুক, হরেক রঙের, হরেক আকারের। মুঠো ভরে ঝিনুক তুলে নিয়ে ভেসে উঠলাম দুজনে। সকালের নাস্তা সারতে পারবো।

ঝিনুকগুলো পিটারকিনের হাতে তুলে দিয়ে আবার ফিরে গেলাম আগের জায়গায়। এবারে আর ঝিনুক নয়, মাছ ধরার চেষ্টা চালালো জ্যাক। প্রবাল ঝাড়ের একটা ডালের মাথায় চুপচাপ ভেসে আছে একটা সুন্দর মাছ। চ্যাপটা, বড়সড় কই মাছের আকার। কুচকুচে কালো রঙের ওপর উজ্জ্বল হলুদ ডোরাকাটা। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

সাবধানে এগিয়ে গেল জ্যাক। নড়ছে না মাছটা। হঠাৎ হাত বাড়ালো সে। ঝপ করে চেপে ধরতে গেল মাছের লেজ। কিন্তু তার চেয়ে ক্ষিপ্র মাছটা। সুড়ুৎ করে গিয়ে ঢুকে পড়লো শেওলার ভেতর। হেসে উঠতে গেলাম, নাকে মুখে পানি ঢুকে

গেল। তাড়াতাড়ি উঠে এলাম ওপরে। কাশি থামাতে বেশ বেগ পেতে হলো।

'ইস্‌স, যদি ধরতে পারতে!' জ্যাককে বললাম। 'স্বাদ নিশ্চয় খুব ভালো। চমৎকার নাস্তা হতো!'

'মাছ ধরতে পারিনি, ঝিনুক তো পেয়েছি। ওতেই ভালো নাস্তা হবে। চলো।'

তীরে এসে উঠলাম। কাপড়চোপড় পরে নিলাম তিন জনেই। কয়েকটা নারকেল কুড়িয়ে আনলো পিটারকিন। ঝিনুকের খোলা ছাড়াতে বসলো।

'কি সুন্দর!' কুড়ালের ফলার কোণ দিয়ে চাড় মেরে একটা ঝিনুকের ডালা ফাঁক করে ফেলেছে পিটারকিন। 'নিশ্চয় ভালো স্বাদ। এমনিতেই ঝিনুক আমার খুব পছন্দ।'

'খুব ভালো,' হাসি হাসি গলায় বললো জ্যাক। 'তোমার পছন্দের জিনিস কি, জানলাম। ডুব দিতে জানো না, নিজে নিজে ঝিনুক তুলে আনতে পারবে না। আমাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। তোমাকে শায়েস্তা করা সহজ হবে। একটু তেড়িবেড়ি করলেই ঝিনুক বন্ধ করে দেবো।'

হেসে উঠলাম আমি।

পিটারকিনও হাসলো। একটা ঝিনুকের দুই ডালা দুই আঙুলে টেনে ধরে আমার মুখের ওপর নিয়ে এলো। 'হাঁ করো।'

কাঁচা ঝিনুক খাবো! কিন্তু বন্ধুদের হাসির পাত্র হতে চাই

না। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই হাঁ করলাম।

খোসা ভেঙে কাঁচা ডিম ফেলার মতোই ঝিনুকের ভেতরের অংশ খসিয়ে আমার মুখে ছেড়ে দিলো পিটারকিন। না, যা ভেবেছিলাম, তা তো নয়। কাঁচা ডিমের মতো আঁশটে একটা গন্ধ আছে বটে, কিন্তু চমৎকার স্বাদ! দু-একবার চিবিয়েই ঢোঁক করে গিলে ফেললাম।

'খালি কাঁচা না, ঝিনুকের রোস্টও খাওয়াবো,' বললো জ্যাক। টেলিস্কোপটা নিয়ে এলো। ওটার এক মাথার কাচ খুলে নিলো। শুকনো ঘাসপাতা জড়ো করে তার ওপর রোদ ফেললো কাচের ভেতর দিয়ে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ করলো কাচটা। প্রথমে ধোঁয়া, তারপর দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

নারকেল আর ঝিনুক দিয়ে নাস্তা সেরে আয়েশের ঢেকুর তুললাম আমরা।

ছয়

নাস্তা শেষ। এবার দ্বীপ ভ্রমণে বেরোতে হবে। দেখতে হবে, কোথায় এসে উঠেছি আমরা।

কাছেই পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা আবিষ্কার করলাম। আমাদের জিনিসপত্র যা আছে, নিয়ে গিয়ে ঢোকালাম ওর ভেতরে। আগুন নেভালাম। এই একটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। যেভাবে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা, দাবানল লেগে যাবার ভয় আছে।

আবার রওনা হলাম। সৈকতের ধার ধরে ধরে চলে এলাম একটা পাহাড়ী উপত্যকায়। পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়েছে একটা ঝর্না, ঢাল বেয়ে নেমে এসে উপত্যকা ধরে এগিয়ে গেছে। এখানে মোড় নিয়ে সাগরের দিকে পেছন ফিরে ঢুকে গেলাম দ্বীপের ভেতরে।

অপরূপ দৃশ্য। দু'ধারে পাহাড়, ধীরে ধীরে উঠে গেছে ঢাল। তাতে গাছের জঙ্গল। বড় লম্বা গাছগুলোর গোড়ায় জন্মেছে ঘনঝোপ। তাতে নাম না-জানা ফুল ফুটে আছে রাশি রাশি।

বাঁয়ে মোড় নিলাম। দুটো পাহাড়ের মাঝে এই পাহাড়টাই বেশি উঁচু। এটার মাথায় চড়লে পরিষ্কার দেখা যাবে দ্বীপের চারপাশে কি আছে। খাড়াই কম, চড়তে মোটেই কষ্ট হলো না। তবে বাধা সৃষ্টি করলো ঝোপঝাড়। কুড়াল দিয়ে ওগুলো সাফ করতে করতে এগোলো জ্যাক, তার পেছনে আমি আর পিটারকিন। আমরাও একেবারে নিরস্ত্র নই। দুজনের হাতে দুটো লাঠি।

শিগগিরই একটা গাছ আবিষ্কার করে বসলো জ্যাক, আমাদের জন্যে আনন্দের ব্যাপার। খুব সুন্দর দেখতে। জ্যাক জানালো, ওটা বিখ্যাত রুটি ফল গাছ।

'বিখ্যাত?' ভুরু কোঁচকালো পিটারকিন।

'নিশ্চয়,' জোর দিয়ে বললো জ্যাক।

'আশ্চর্য!' বললো পিটারকিন। 'আমি কখনো নামই শুনিনি এর।'

'তাহলে তো আর বিখ্যাত বলা যাচ্ছে না,' হাসি হাসি গলা জ্যাকের। হাত বাড়িয়ে পিটারকিনের টুপির কানা ওপরে তুলে দিলো। 'বেশ, একটু ধৈর্য ধরে শুনলে রুটিফলের ওপর সামান্য জ্ঞান দিতে পারি।'

পিটারকিনের চোখ দুটো হাসছে। আবার টেনে টুপিটা আগের জায়গায় বসালো। 'শুনছি। বলো।'

'দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলোর একটা অতি মূল্যবান গাছ এই রুটিফল,' বললো জ্যাক। 'বছরে দুই থেকে তিনবার ফল ধরে।

ফলগুলো দেখতে অনেকটা গোল রুটির মতো, খেতেও রুটির মতোই লাগে। এদিকের মানুষের প্রধান খাদ্য এটা।'

'বাহ্, চমৎকার!' বলে উঠলো পিটারকিন। আমাদের জন্যে সব যেন তৈরি করেই রাখা হয়েছে। ডাবের ভেতরে লেমোনেড, রুটি ফলের গাছ...'

'শুধু খাবারই নয়,' বললো জ্যাক। 'রুটিফল গাছের কচি ডালের বাকল দিয়ে কাপড়ও বানায় এখানকার লোকে। শক্ত-কাঠ দিয়ে ঘর বানায়। তাহলে বুঝতেই পারছো, বুদ্ধি খাটিয়ে চললে এই দ্বীপে খুব সুখেই থাকতে পারবো আমরা।'

'কিন্তু ঠিক চিনেছো? এটা রুটিফলই তো?' জিজ্ঞেস করলো পিটারকিন।

'নিশ্চয়,' জবাব দিলো জ্যাক। 'অনেক ছবি দেখেছি এই গাছের। ভুল হতে পারে না। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আরো অনেক গাছের কথা পড়েছি, ছবি দেখেছি। অনেক আগে পড়েছি তো বেশির ভাগই ভুলে গেছি এখন। তবে দেখলে হয়তো চিনতে পারবো।'

'বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি লেখাপড়া করেছো তুমি, জ্যাক,' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো পিটারকিন। 'অনেক বেশি জানো। এতো বুদ্ধিমান...'

'হয়েছে হয়েছে,' হাত তুলে বাধা দিলো জ্যাক। 'এবার চলো। কাছে থেকে ভালো করে দেখি গাছটা।'

ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গাছের গোড়ায় চলে এলাম

আমরা। ফলে বোঝাই। সবুজ, বাদামী এবং উজ্জ্বল হলুদ। কিছু পেড়ে নেবার ইচ্ছেটা জোর করে রোধ করলাম। পরেও পাড়া যাবে। আগে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখতে হবে, চার-পাশে কি আছে!

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চলে অবশেষে চূড়ায় পৌঁছুলাম। যা ভেবেছি তা নয়। এই পাহাড়টা দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু পাহাড় নয়। পাশেই আরেকটা পাহাড় আছে, আরো উঁচু। দুটো পাহাড়ের মাঝের উপত্যকা অনেক বেশি চওড়া। ঘন হয়ে জন্মেছে সেখানে সবুজ গাছপালা, ঝোপঝাড়। প্রাকৃতিক এক অপরূপ বাগান! গাছগুলোর বেশির ভাগই রুটি ফল, আর নারকেল।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা ওখানে। নিচের দৃশ্য দেখলাম। তারপর নেমে চললাম ওপাশে। সুন্দর ওই উপত্যকা পেরিয়ে এসে পৌঁছুলাম বড় পাহাড়টার গোড়ায়। উঠতে শুরু করলাম ঢাল বেয়ে।

সাত

ঘন ঝোপঝাড় কেটে এগোতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করে বসলাম। বিরাট এক গাছের গুঁড়ি। গাছটা কেটে নেয়া হয়েছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে। দেখে মনে হলো কুড়ালের কাটা। তারমানে দ্বীপে আমরাই প্রথম মানুষ নই! কে সে? সভ্য, না অসভ্য নরখাদক? ভাবনায়ই পড়ে গেলাম।

গুঁড়িটা শেওলায় ঢেকে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, অনেক আগে কাটা হয়েছে ওই গাছ।

'হয়তো,' বললো পিটারকিন, 'জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে গিয়েছিলো কোনো জাহাজের। কেটে নিয়ে গেছে।'

কথাটায় যুক্তি আছে, কিন্তু তবু মেনে নেয়া যায় না। জ্বালানী কাঠের জন্যে এতো ভেতরে আসার কোনো দরকার নেই। তাছাড়া এতো বড় গাছে কতশো' মণ জ্বালানী হবে! এতো জ্বালানীর দরকারই নেই কোনো জাহাজের।

'বুঝতে পারছি না!' কুড়াল দিয়ে চেঁছে শেওলা পরিষ্কার করছে জ্যাক। 'কোনো কারণে হয়তো অসভ্যরা কেটে নিয়ে গেছে। কিন্তু কি কারণ।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'আরে

আরে! এটা কি!'

'কি!' কাছে ঝুঁকে এলাম আমি আর পিটারকিন।

তাড়াহুড়ো করে চেঁছে গুঁড়ির ওপরের দিকটা আরো পরিষ্কার করলো জ্যাক। খোদাই করে লেখা আছে দুটো অক্ষর। ইংরেজি 'জে' এবং 'এস'-এর মতোই মনে হলো, তবে নিশ্চিত হতে পারলাম না। অবাক হয়ে চেয়ে আছি লেখাটার দিকে। কি এর মানে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

শেষে হাল ছেড়ে দিলাম। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আবার উঠতে শুরু করলাম। এসে উঠলাম চূড়ায়।

এটাই দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু জায়গা। নিচে তাকালাম। ভূগোল বইয়ের পাতা থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসে বিশাল আকার নিয়ে শুয়ে পড়েছে যেন একটা ম্যাপ। বিচিত্র রঙে এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কোথায় কি আছে। দুটো পাহাড়: একটা পাঁচশো ফুট, আরেকটা তার দ্বিগুণ। মাঝে গাছপালায় ঢাকা সুন্দর উপত্যকা চলে গেছে দ্বীপের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো ঢাল পাহাড়ের। তার কোথাও কোথাও ঝর্না। ঝর্নার দুপাশে জঙ্গল।

আড়াআড়ি ভাবে মাইল দশেক হবে দ্বীপটা। প্রায় গোলাকার। চারদিক থেকে ঘিরে আছে সাগর। চারদিকেই শাদা বালির সৈকত। দ্বীপটাকে ঘিরে আছে প্রবাল প্রাচীর, তবে মাঝের দূরত্ব সব জায়গায় এক রকম নয়। কোথাও মাইল-খানেক, কোথাও মাত্র কয়েকশো গজ। তবে বেশির ভাগ

জায়গাতে সৈকত থেকে প্রাচীরের ফারাক আধা মাইলের মতো।

পুরো দেয়ালে মোট তিনটে ফাটল, খোলা সাগরে বেরোনোর পথ। তিনটে পথকে তিনটে বিন্দু ধরে রেখা টেনে যোগ করে দেয়া গেলে, প্রায় সমবাহু একটা ত্রিভুজ হয়ে যাবে। আমরা যে উপত্যকায় বাসা বেঁধেছি, সেদিকে একটা পথ। জাহাজডুবি হয়েছে ওদিকে, তাই উপত্যকাটার নাম দিলাম জাহাজ-উপত্যকা। প্রবাল প্রাচীরের ওপরটা সমান চওড়া নয়। কোথাও মাত্র কয়েক গজ, আবার কোথাও শ'খানেক গজ। ঝোপঝাড় জন্মে আছে। দুটো ফাটলের দু'ধারে ঝোপ আছে। ঝোপের মাঝ থেকে গজিয়ে উঠেছে দুটো করে নারকেল গাছ। ইচ্ছে করেই গাছগুলো পুঁতেছে যেন ওখানে কেউ, প্রাকৃতিক ফটক তৈরি করেছে।

প্রাচীরের মাঝের ল্যাগুনেও অনেক ছোটো ছোটো দ্বীপ রয়েছে। তার বাইরে, আধ থেকে দশ মাইলের ভেতরে রয়েছে আরো অনেক ছোটো-বড় দ্বীপ। তবে ওগুলোর সব চেয়ে বড়টাও আমাদের এই দ্বীপের চেয়ে ছোটো। সবকটাই প্রবালে তৈরি, পানি থেকে সামান্য উঁচু, ঘন হয়ে জন্মেছে নারকেল গাছ।

দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে ম্যাপটা। আর কিছু দেখার নেই আপতত। এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

ফেরার পথে আরো অনেক চিহ্ন দেখলাম। আমাদের আগে

মানুষ এসেছিলো এই দ্বীপে, আর কোনো সন্দেহ নেই। তবে এসেছিলো অনেক অনেক বছর আগে।

হরেক রকমের, হরেক রঙের পাখি আছে দ্বীপে। জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপও দেখলাম। খুরের দাগ চোখে পড়লো। তবে তার মালিককে দেখতে পেলাম না কোথাও। দাগগুলো নতুন। তারমানে খাবার মতো পশুও আছে এখানে।

জাহাজ-উপত্যকায় ফিরে এলাম। মন আনন্দে পরিপূর্ণ।

আট

পরের কয়েকটা দিন বাড়ি ছেড়ে বেশি দূরে গেলাম না। নানা-রকম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করলাম : কি করে বাড়ি ঘরের আরো উন্নতি করা যায়, কি করে আরো সুখে বসবাস করা যায় প্রবাল দ্বীপে. এমনি সব জরুরী পরিকল্পনা।

ডালপাতা দিয়ে চমৎকার এক কুঁড়ে ঘর তৈরি করলাম আমরা। সুন্দর একটা ছুরি বানিয়ে নিলো জ্যাক। দাঁড়ের মাথায় পরানো লোহার পাতটা খুলে কুড়ালের উল্টো পিঠ দিয়ে পিটিয়ে সমান করে নিলো। ছোটো একটা ডাল কেটে নিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধলো পাতটার সঙ্গে। পাথরে ঘষে পাতের একটা দিক ধার করে নিলো। এটার সাহায্যে ডাল কেটে সুন্দর একটা বাঁট বানালো। পাতটা ডাল থেকে খুলে নিয়ে বাঁটের সঙ্গে বাঁধলো রুমাল ছেঁড়া ফিতে দিয়ে। ব্যস, হয়ে গেল ছুরি।

ছোটো দড়িটা দিয়ে বড়শি বানিয়েছে পিটারকিন। দড়ির এক মাথায় শক্ত করে একটা ঝিনুক বেঁধে পানিতে ফেলে। এক সময় ঝিনুকটা গিলে নেয় মাছ। ওটাকে দড়ি ধরে টেনে

তোলে সে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকেই সাঁতার কাটতে যাই আমি আর জ্যাক। ডুব দিয়ে চলে যাই পানির নিচে। ওখানকার বাগান যেন চিরনতুন, কখনো পুরানো হয় না আমাদের কাছে।

একদিন, সৈকত থেকে ফিরে এলো পিটারকিন। হাতে ছোটো ছোটো কয়েকটা মাছ। ধপ করে আমাদের পাশে বসে পড়লো সে। বললো, 'নাহ্, আর ভালো লাগে না! এসব ছোটো মাছ ধরে মজা নেই! জ্যাক, এক কাজ করো না। আমাকে পিঠে তুলে সাঁতরে নিয়ে চলো গভীর পানিতে। বড় মাছ ধরবো।'

হেসে ফেললাম আমি।

'বা-বা-বা-বা-বা! কি আবদার! উনাকে পিঠে করে নিয়ে যাই!' খেঁকিয়ে উঠলো জ্যাক। 'আমাকে নৌকা পেয়েছো?'

'জ্যাক, সত্যি বলছি, আর ছোটো মাছ ধরতে ভালো লাগছে না,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো পিটারকিন। 'একটা কিছু ব্যবস্থা করো। গভীর পানিতে যেতেই হবে।'

'হুঁম্‌ম্! নৌকা একটা বানাতেই হচ্ছে,' মাথা ঝাঁকালো জ্যাক। 'তবে সে-তো অনেক সময়ের ব্যাপার। ঠিক আছে, অন্য ব্যবস্থা করছি।'

'কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইলাম।

'গাছ।'

'গাছ!'

'একটা বড় গাছ কেটে পানিতে ফেলতে পারি আমরা,' বললো জ্যাক। 'ভেসে থাকবে। ওতে চড়েই মাছ ধরতে যাওয়া যাবে।'

'ঠিক ঠিক!' খুশি হয়ে উঠলো পিটারকিন।

তখুনি উঠে পড়লাম আমরা।. পানির ধারেই অনেক গাছ জন্মে আছে। একটা মাঝারী আকারের গাছ বেছে নিলো জ্যাক। কাজে লেগে গেল কুড়াল নিয়ে। মিনিট পনেরো একটানা কুপিয়ে থামলো। ঘামছে দরদর করে। সরে এসে বিশ্রাম নিতে বসলো ঘাসের ওপর।

আমি তুলে নিলাম কুড়াল। কিছুক্ষণ কুপিয়ে তুলে দিলাম পিটারকিনের হাতে। সব শেষে আবার কোপাতে লাগলো জ্যাক।

প্রচণ্ড মড়-মড়াৎ শব্দে আছড়ে পড়লো গাছ। গোড়ার দিক থেকে আঠারো ফুটের মতো বাদ দিয়ে আগাটা কেটে ফেলে দিলো জ্যাক। ডাল পাতা ছেটে ফেললো। বড়সড় তিনটে ডাল কেটে দুটো তুলে দিলো আমাদের হাতে।

ভারি গাছ। তিনটে ডালকে রোলারের মতো ব্যবহার করে গাছটাকে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেললাম পানিতে। ওই ডাল-গুলোকেই কেটেছেটে তিনটে দাঁড় বানিয়ে ফেললো জ্যাক।

গাছ পানিতে ভাসছে, দাঁড়ও তৈরি হয়ে গেছে। আর কিসের অপেক্ষা? দড়ির বড়শি আর ঝিনুকের টোপ নিয়ে গাছটায় উঠে বসলো পিটারকিন। আমি আর জ্যাকও চড়লাম।

দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চললাম গভীর পানির দিকে।

খুব কঠিন কাজ। গাছটার বেশির ভাগই তলিয়ে আছে পানিতে। ফলে হালকা হয়ে গেছে অনেক। আরোহীদের সামান্যতম নড়াচড়াতেই গড়িয়ে সরে যেতে চাইছে পায়ের ফাঁক থেকে। ভারসাম্য ঠিক রাখাই মুশকিল হয়ে উঠেছে আমাদের জন্যে।

যাইহোক, গভীর পানিতে এসে পৌঁছুলাম। বড়শিতে ঝিনুক বেঁধে পানিতে ফেললো পিটারকিন।

'খবরদার!' পিটারকিনকে হুঁশিয়ার করলো জ্যাক। 'আগাছা বাঁচিয়ে ফেলবে। কোনকিছুতে দড়ি আটকে গেলে মাছ ধরার কাম সারা। আমি দেখছি, তুমি ফেলো। হ্যাঁ, আস্তে··· ডানে···আরেকটু বাঁয়ে···হ্যাঁ, হয়েছে···ওই যে, আসছে এক ব্যাটা···ফুট খানেক লম্বা··· হাঁ করেছে···মুখে নিয়েছে··· গিলছে···গিলছে···মারো টান! মারো! আহ্হা, গেল তো ছুটে!'

কাচের মতো পরিষ্কার পানি। তলা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড় দিয়ে বার দুই পানিতে খোঁচা লাগালো জ্যাক। কয়েক ফুট এগোলো গাছ। 'টান লেগেছিলো দড়িতে?'

'টান? হ্যাঁ, সামান্য,' বললো পিটারকিন। 'কিন্তু আমি জোরে টানতেই মুখ হাঁ করে ফেলেছে ব্যাটা। ঝিনুকটা বেরিয়ে চলে এসেছে। আসলে গিলেইনি···'

'পরের বার সময় দেবে গেলার,' উপদেশ দিলো জ্যাক

আবার বড়শি ফেললো পিটারকিন। এবার নিজেই চেয়ে রইলো নিচের দিকে। 'ওই যে, আসছে আবার ব্যাটা! আগেরটাই মনে হচ্ছে! খা, খা! হ্যাঁ, ধর। গিলে ফেল! গিলে ফেল। আহ্‌হা, মুখে নিয়েও আবার বের করে দিলো! দূর! আজ আর হবেই না।'

'এতো সহজেই হাল ছাড়ছো কেন?' বললো জ্যাক। 'চলো, অন্য দিকে যাচ্ছি। এক-আধটা বোকা বুদ্ধুকে পেয়ে গেলেই, ব্যস...'

দাঁড় বাইতে লাগলো জ্যাক। কয়েক ফুট এগোতে না এগোতেই দেখা গেল ওটাকে। পাঁচ-সাত ফুট পানির তলে। দেহের তুলনায় অনেক বড় মাথা। পিটারকিন বড়শি ফেলতে না ফেলতেই বিরাট হাঁ করে ছুটে এসে গিলে ফেললো টোপ।

'এইবার! এইবার পেয়েছি!' দড়ি টানতে টানতে চেঁচিয়ে উঠলো পিটারকিন। 'বাপরে বাপ! এমন রাক্ষস আর দেখিনি! মুখের হাঁ দেখেছো কতো বড়!'

টানে টানে উঠে এলো মাছটা। মাথা তুললো পানির ওপরে। সবাই চেয়ে আছি ওটার দিকে। বোধহয় একদিকে একটু বেশি কাত হয়ে পড়েছি তিনজনেই, ব্যস, গড়ান দিলো গাছ। পড়ে গেলাম পানিতে। পড়ার আগেই থাবা মারলো পিটারকিন। মাছটাকে জড়িয়ে ধরে তবে পড়লো।

আবার গাছে উঠে বসলাম আমরা। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড় হলো তিনজনেরই। তবে, আরো

সাবধান হলাম। পা দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম গাছটাকে, পায়ের তলা থেকে যেন সরে যেতে না পারে।

'যাক, এতোদিনে একটা কাজের কাজ হলো!' মাছটা নিয়ে খুব খুশি পিটারকিন। 'চুনোপুঁটি ধরতে আর ভালাগ-ছিলো না।'

গাছের গায়ে বাড়ি দিয়ে মাছটাকে মেরে ফেললো পিটার-কিন। তারপর আমার হাতে তুলে দিলো। দড়ির মাথায় ঝিনুক বেঁধে পানিতে ফেললো আবার।

নয়

মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত আমরা। হঠাৎ সামনে কয়েক গজ দূরে পানিতে একটা আলোড়ন চোখে পড়লো।

'জলদি! জলদি ওখানে নিয়ে চলো!' চেঁচিয়ে বললো পিটারকিন। 'খুব বড় মাছ! ওটাকে ধরতে হবে!'

পিটারকিনের কথায় কান দিলো না জ্যাক। চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে পানির দিকে। বোঝার চেষ্টা করলো এক মুহূর্ত, চেঁচিয়ে উঠলো পরক্ষণেই। 'পিটারকিন, জলদি দড়ি তুলে নাও! দাঁড় ধরো! জলদি! ওটা হাঙর!'

কথাটা শুনে যেন জমে গেলাম। ভয়ানক বিপদে পড়েছি। পানিতে ডুবে থাকা একটা গাছে বসে আছি। পা, উরু ডুবে আছে পানিতে। টান দিয়ে যে তুলে আনবো, তারও উপায় নেই। গড়িয়ে সরে যাবে গাছ, উল্টে পড়বো পানিতে। সেটা আরো মারাত্মক।

বিন্দুমাত্র দেরি করলো না পিটারকিন, দড়ি তুলে নিলো।

দাঁড় বাইতে শুরু করেছে জ্যাক। আমি আর পিটারকিনও যোগ দিলাম। তীর থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা।

যতো তাড়াহুড়োই করি না কেন, ভারি গাছ যেন নড়তেই চায় না। দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল হাঙর। আমাদেরকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো।

হাঙরের স্বভাব সম্পর্কে আমি কিংবা পিটারকিনের চেয়ে অনেক বেশি জানে জ্যাক। 'আরে!···আরো জোরে টানো! আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে ব্যাটা!'

প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলাম।

'ওই···ওই যে আসছে! হুঁশিয়ার!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক।

ডুব দিয়েছে বিশাল হাঙর। চোখের পলকে চলে এলো কাছে। পানির তলায় দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। উল্টে গেল ওটা, ওপরের দিকে এখন ধূসর-শাদা পেট। হাঙরের মুখ নিচের দিকে, কোনো কিছু কামড়াতে হলে উল্টে গিয়ে কামড়ায়।

জোরে চেঁচামেচি শুরু করলাম আমরা। দাঁড় দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মারতে লাগলাম পানিতে। ভড়কে গেল হাঙর। চলে গেল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। আবার ফিরে এলো ওটা। আমাদের চারপাশে চক্কর দিতে লাগলো।

'মাছটা ছুঁড়ে দাও!' চেঁচিয়ে বললো জ্যাক। 'কয়েক মিনিট ঠেকাতে পারলেই তীরে পৌঁছে যেতে পারবো!'

ছুঁড়ে দিলাম। মাছটা পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল হাঙর। পরমুহূর্তেই পানি ফুঁড়ে বেরোলো তার চোখা

নাক। বিশাল হাঁ। কয়েক সারি তীক্ষ্ণ দাঁত চোখে পড়লো পরিষ্কার। কাঁটা দিয়ে উঠলো গায়ে। গায়ের জোরে দাঁড় বাইতে লাগলাম।

মাছটা গিলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হাঙর। যাক, গেল বোধহয়! বাঁচলাম!

কিন্তু না, মোটেই যায়নি ব্যাটা! কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলো আবার। মাছটা খেয়ে ওর খিদে আরো বেড়েছে। মাত্র একবার চক্কর দিলো আমাদেরকে ঘিরে। তারপর সোজা ছুটে এলো সাঁ করে। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতি!

'দাঁড় বাওয়া বন্ধ!' চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক। 'পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখো গাছ, গড়াতে যেন না পারে! কোনোদিকেই তাকানোর দরকার নেই! যা বলছি করো…'

আঁকড়ে ধরলাম গাছটা।

পরের কয়েকটা সেকেণ্ড কয়েক যুগ বলে মনে হলো আমাদের কাছে। জ্যাকের নির্দেশ অমান্য করে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইলাম। পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে জ্যাক। হাতের দাঁড় তুলে নিয়েছে দু' হাতে, তাকিয়ে আছে পানির দিকে।

পানি চিরে তীর গতিতে ছুটে এলো হাঙরের পিঠের পাখনা। জ্যাককে নিশানা করেছে। গাছের কাছে চলে এলো হাঙর। শেষমুহূর্তে চট করে পা তুলে নিলো জ্যাক। হাঙরের খসখসে চামড়ার ঘষা লাগলো গাছের গায়ে। ভুসস করে পানির ওপর নাক তুললো ওটা। এতো কাছে থেকে ওর মুখের ভেতরটাও

দেখতে পেলাম পরিষ্কার। ইতিমধ্যেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জ্যাক। হাঙরের হাঁ করা মুখে দাঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে গুঁতো লাগালো।

এতো নড়াচড়া, কিছুতেই স্থির রাখতে পারলাম না গাছটাকে। জোরে এক গড়ান দিলো। কাত হয়ে পানিতে পড়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম গাছটাকে। উঠে বসতে গিয়ে দেখি, পিটারকিন আর জ্যাকও পানিতে মাথা তুলেছে, ওরাও পড়ে গিয়েছিলো। হাঙরটা চোখে পড়লো না।

'সাঁতরাও!' আদেশ দিলো জ্যাক। 'সোজা তীরের দিকে!'

সাঁতরাতে শুরু করলাম।

'আমার গলা জড়িয়ে ধরো, শক্ত করে!' পেছনে আবার শুনলাম জ্যাকের গলা। পিটারকিনকে বলছে।

পিঠে সওয়ারী নিয়েও দ্রুত আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল জ্যাক। সাঁতারু বটে! আমি ওর কাছাকাছি থাকতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।

পৌঁছে গেলাম অগভীর পানিতে। এখানে আসতে পারবে না বিশাল হাঙর। বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলাম তীরে। পেছন ফিরে চাইলাম। আবার ফিরে এসেছে ব্যাটা! পিঠের পাখনা দেখা যাচ্ছে, চক্কর দিচ্ছে গাছটাকে ঘিরে।

দশ

প্রবাল দ্বীপে এসে ওঠার পর এই প্রথম সত্যি সত্যি বিপদের মুখোমুখি হলাম আমরা। চুপসে গেলাম ফাটা বেলুনের মতো। মাছ ধরা বন্ধ, এমন কি ঝিনুক কুড়ানোও। তীরের কাছাকাছি অগভীর পানিতে যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, অন্তত যতোদিন না একটা নৌকা বানিয়ে নেয়া যায়।

মন খারাপ হয়ে গেল পুরোপুরি। সাঁতার কাটাও বন্ধ। পানির তলার অপরূপ বাগানে বেড়াতে যেতে পারবো না আর। অথচ এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এটা, আমার আর জ্যাকের জন্যে। হাতছানি দিয়ে ডাকবে নীল পানি, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো না, ইচ্ছেমতো সাঁতার কাটতে পারবো না, এটা একেবারেই অসহ্য। কিছু একটা উপায় বের করতেই হবে।

মানুষের প্রয়োজনই তাকে সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য করে। আমাদের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার ঘটলো। আর যা-ই করি না করি, সাঁতার না কেটে পারবো না। খুঁজতে বেরোলোম, এমন একটা জায়গা, যেখানে হাঙরের ভয় নেই।

বেশি খুঁজতে হলো না। পেয়ে গেলাম। আমাদের কুঁড়ে থেকে মিনিট দশেকের পথ। মাঝারি আকারের ল্যাগুন। সাগরের দিকটা ঘিরে রেখেছে প্রবাল প্রাচীর। অতি সরু একটা ফাটল দিয়ে সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ। এতোই সরু, হাঙর কিংবা বিপজ্জনক অন্য কোনো বড় জলজ প্রাণী প্রবেশ করতে পারবে না।

ল্যাগুনটার নাম রাখলাম আমরা 'জলজ বাগান'। এর আগে যেখানে ডুব দিতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর এই ল্যাগুন। পানির তলায় প্রবাল ঝাড়ও অনেক বেশি বিচিত্র। হিংস্র প্রাণীর ভয় নেই, তাই এখানে নিরীহ জলজ জীবের সংখ্যা অনেক বেশি। পেছনের পাথুরে পাহাড়ের জন্যে বাতাস লাগতে পারে না তেমন, প্রবাল প্রাচীরের জন্যে ঢেউও আসতে পারে না সাগরের দিক থেকে। তাই পানি এখানে সব সময়ই শান্ত। আর কি পরিষ্কার! কোথাও কোথাও পঁচিশ-তিরিশ ফুট গভীর, কিন্তু তলার বালিতে একটা সুচ পড়লেও ওপর থেকে দেখা যাবে।

ল্যাগুনটা ভালো লাগার আরো কারণ আছে। এক জায়গায় পানির ভেতর থেকে উঠে গেছে পাহাড়ের দেয়াল। চ্যাপটা বড় একটা পাথর ঠেলে বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে। ওটাতে উঠার পথও আছে। ডাইভিঙের খুব চমৎকার ব্যবস্থা। ওটার ওপর উঠে পানিতে ঝাঁপ দিতে পারবো আমি আর জ্যাক। পিটারকিন অবশ্য পারবে না, বড়জোর ওটাতে বসে

বসে আমাদের সাঁতার দেখতে পারে সে।

জায়গা পছন্দ হয়েছে। আর দেরি করলাম না। ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিলাম। ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে চলে যাই গভীর পানিতে, তলার আগাছা আঁকড়ে ধরে বসে থাকি। তাড়া করি মাছদের। দেখে, পিটারকিন আমাদের নাম দিয়ে দিলো : সাগরের সাদা জন্তু।

ল্যাগুনের পানিতে ডুব দিয়ে অনেক আশ্চর্য তথ্য জানতে পারলাম আমি আর জ্যাক। রীতিমতো গবেষণা চালালাম সামুদ্রিক জীব আর উদ্ভিদের ওপর। বালিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে অগুণিত তারামাছ, ঝিনুক-শামুক, আর্চিন। রঙিন প্রবালের ঝাড়ে মাছের বাসা। দেখতে দেখতে সময় কোথা দিয়ে বয়ে যায়, খেয়ালই থাকে না।

ল্যাগুনের পাশেই পাথুরে একটা খাদে অ্যাকোয়ারিয়াম বানালাম আমি। তাতে জিইয়ে রাখলাম মাছ, ঝিনুক, শামুক। অবসর সময় কাটে ওগুলোর ওপর নিরীক্ষা চালিয়ে। টেলিস্কোপ থেকে খুলে নেয়া আতস কাচটা খুব কাজে লাগে এ-সময়।

এই সময়ই একদিন দ্বীপের ভেতরে তল্লাসি অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করলাম। সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চাইলাম আমি আর পিটারকিন। কিন্তু বাধা দিলো জ্যাক। বললো, খালি হাতে বেরিয়ে পড়া ঠিক হবে না। কোথায় কোন বিপদ ঘাপটি মেরে আছে, কে জানে? অস্ত্রশস্ত্র

কিছু সঙ্গে থাকা দরকার।

'তাছাড়া,' বললো জ্যাক, 'নারকেল আর ঝিনুক খেতে খেতে জিভে চরা পড়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। আর ভালাগছে না। একনাগাড়ে কতো খাওয়া যায়? মাঝেমধ্যে মাংস পেলে রুচি বদলানো যেতো। গাছে গাছে অসংখ্য পাখি, ধরতে পারলেই খাওয়া যায়। কিন্তু ধরবো কি দিয়ে? আমি ভাবছি, তীর-ধনুক বানিয়ে নেবো।'

'চমৎকার আইডিয়া!' আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো পিটারকিন। 'তুমি ধনুক বানাও, আমি তীর বানিয়ে দেবো। দেখলেই পাথর ছুঁড়ে মারি, কিন্তু লাগাতে পারলাম না আজ পর্যন্ত।'

'ভুলে গেছো,' মনে করিয়ে দিলাম, 'আমার পায়ে লাগিয়েছিলে একদিন।'

'আমি পাখির কথা বলছি,' বললো পিটারকিন। 'তোমার পায়ে লাগিয়েছিলাম, তুমিও ছাড়োনি। পাথরটা তুলে ঠিক ছুঁড়ে মেরেছিলে আমাকে। তবে হ্যাঁ, আমার চেয়ে তোমার হাত অনেক বেশি সই। পাখিটার কাছ থেকে গজ চারেক বাঁয়ে ছিলে তুমি। তাহলে বুঝতেই পারছো, কেমন সই আমার হাত!'

'কাজের কথায় আসা যাক,' বললাম। 'জ্যাক, আজকের মধ্যেই তিনটা ধনুক আর তীর বানানো সম্ভব না। একটা করে বানাও। আমরা একটা করে মুগুর বানিয়ে নেবো।'

'ঠিক,' সায় দিলো জ্যাক। 'যাবো বললে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। তবে, বেলা আর বেশি বাকি নেই। একটা ধনুকই বোধহয় বানিয়ে সারতে পারবো না।' আলো থাকবে না। বাতি থাকলে রাতেও কাজ করা যেতো।'

সূর্য ডোবার পর পরই খেয়েদেয়ে শুতে যাবার অভ্যাস করে ফেলেছি আমরা। আবার ভোরের পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ি। জলজ বাগানে গিয়ে গোসল সেরে ঝিনুক আর নারকেল নিয়ে ফিরে আসি। নাস্তা সেরে কাজে লাগি। প্রবাল দ্বীপে আসার পর এই প্রথম বাতির প্রয়োজন বোধ করলাম।

'আগুনের আলোয় কাজ করতে পারবে না?' প্রশ্ন করলো পিটারকিন।

'তা পারবো,' বললো জ্যাক। 'তবে এমনিতেই যা গরম! আগুনের কাছাকাছি থাকতে খুব কষ্ট হবে। ঠিকমতো কাজ করতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'হাঁ,' চিন্তিত দেখালো পিটারকিনকে। 'সেদ্ধ হয়ে যাবো।'

'এসব দ্বীপে এক ধরনের বাদাম থাকে। বইয়ে পড়েছি, ওগুলো দিয়ে বাতি জ্বালায় আদিবাসীরা। ক্যাণ্ডেল-নাট বলে...'

'তাহলে ওই বাদাম দিয়ে বাতি বানিয়ে নিলেই তো হয়,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো পিটারকিন। 'এতোদিন খামোকা অন্ধকারে রেখেছো কেন আমাদের?'

'তা তো হয়,' বললো জ্যাক। 'কিন্তু ক্যাণ্ডেল নাট পাবো কোথায়?'

'কেন, এ-দ্বীপে নেই ? দেখতে কেমন ?'

'আকারে আখরোটের সমান। রূপালী পাতা···'

'দেখেছি !' চেঁচিয়ে উঠলো পিটার কিন। 'দেখেছি আমি···'

'কোথায় ?'

'এই তো, আধ মাইল হবে এখান থেকে।'

'চলো চলো, দেখি !' কুড়াল নিয়ে উঠে দাঁড়ালো জ্যাক।

সত্যিই, ক্যাণ্ডেল নাটের গাছই দেখেছে পিটারকিন। চক-চকে শাদা পাতা, দূর থেকে রূপালী দেখায়।

আশপাশের ঘন সবুজের মাঝে গহনার মতো ফুটে আছে। পকেট বোঝাই করে বাদাম পেড়ে নিলাম আমরা।

ফেরার পথে পিটারকিনকে একটা নারকেল গাছে তুলে দিলো জ্যাক। আমরা সাঁতারে পটু, কিন্তু গাছে চড়ার বেলায় পিটারকিনের কাছে কিছুই না। উঁচু উঁচু নারকেল গাছে বানরের মতো উঠে পড়ে সে।

গাছের মাথায় চড়ে বসে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে একটা ডগা কাটলো পিটারকিন। মাঝখানের কচি ডগা পেঁচিয়ে থাকা গামছার মতো জিনিসও কেটে নিলো খানিকটা জ্যাকের নির্দেশে। তারপর নেমে এলো।

ধনুক বানানোর উপযোগী চারাগাছ কাটলো জ্যাক। তীর বানানোর জন্যে সরু সোজা ডাল কেটে নিলো পিটারকিন। আমি কাটলাম মাঝারি আকারের দুটো ডাল, মুগুর বানাবো। ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো দেখতে ছোটো একটা ডাল কেটে

নিলো জ্যাক।

'ওটা দিয়ে কি হবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'গুলতি বানাবো। তোমার হাত বেশ সইই আছে, মনে হচ্ছে। পাখি মারতে পারবে।'

খুশি হলাম। কি করে কি দিয়ে গুলতি বানাবে জ্যাক, ভেবে অবাকও হলাম।

ঘরে ফিরে এলাম আমরা।

প্রথমেই বাতি বানাতে বসলো জ্যাক। কয়েকটা বাদামের ছাল ছাড়িয়ে নিলো। তামার পেন্সিলের মাথা দিয়ে একটা করে ছিদ্র করলো প্রতিটি বাদামের গায়ে। নারকেলের কাঁচা ডগা কেটে কয়েকটা ছোটো ছোটো সরু কাঠি বানালো। দুই মাথা-ই চোখা করে নিলো। একটা মাথা ঢুকিয়ে দিলো ছিদ্রের মধ্যে। অন্য মাথা গাঁথলো মাটিতে। কাঠির মাথায় আটকে বসে রইলো বাদাম। আগুন লাগতেই জ্বলে উঠলো। অন্ধকারে বেশ ভালো আলো দেবে।

সাঝের সঙ্গে সঙ্গেই রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে কাজে বসে গেলাম আমরা।

বাতির আলোয় কাজ করে যাচ্ছি। খুব ব্যস্ত। কথাবার্তা কম হচ্ছে। বাইরে নিঝুম রাত।

হঠাৎ কানে এলো চিৎকারটা। রাতের নিস্তব্ধতা ফুঁড়ে ছুটে এলো যেন। তীক্ষ্ণ কর্কশ। আতংকিত। ঠিক কোন দিক থেকে এলো; বোঝা গেল না। তবে সাগরের দিক থেকে এসেছে,

সন্দেহ নেই। অনেক দূরে রয়েছে সে আমাদের কাছ থেকে। কে?

ছুটে বেরিয়ে এলাম কুঁড়ে থেকে। সৈকতে এসে দাঁড়ালাম। কালো সাগরে ফসফরাসের ঝিকিমিকি। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ফিরে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছি, এই সময় আবার শোনা গেল চিৎকার। কাঁপা কাঁপা টানা আর্তনাদ করে উঠেছে যেন কেউ, গাধার ভয়ার্ত ডাকের সঙ্গে মিল আছে। থমকে দাঁড়ালাম।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। ঘোলাটে আলোয় কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে সামনের সাগর, পেছনের বনভূমি। কিন্তু কই, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না! চাঁদের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে সাগরের বুকে দ্বীপগুলো। মরে, আকাশের দিকে পেট তুলে দিয়ে অনড় ভেসে আছে যেন নাম-না-জানা কতগুলো সাগর-দানব।

গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি তিনজনে।

'কি ওটা!' 'ফিসফিস করে বললো পিটারকিন।'

'জানি না!' নিচু গলায় বললো জ্যাক। 'এর আগেও দুবার ওই চিৎকার শুনেছি, রাতের বেলা। আজকের মতো এতো জোরালো ছিলো না। ভেবেছিলাম, ভুল শুনেছি। যদি ভয় পেয়ে যাও, এজন্যে বলিনি তোমাদের।'

'অদ্ভুত, তাই না?' বললো পিটারকিন। আমার দিকে

ফিরলো, 'রালফ, ভূত বিশ্বাস করো তুমি ?'

'অ্যাঁ···না !' ঢোক গিললাম। 'তবে···সত্যি, ভয় পাচ্ছি এখন !'

'তোমার কি মনে হয়, জ্যাক ?' জিজ্ঞেস করলো পিটার-কিন। 'কিসের চিৎকার ?'

'ভূত বিশ্বাস করি না আমি, ভয়ও পাচ্ছি না। নিজের চোখে কখনো ভূত দেখিনি, সত্যি সত্যি দেখেছে, এমন কারো সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়নি। সব সময়েই দেখে এসেছি, প্রতিটি রহস্যের পেছনে কোনো না কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। কারণটা জানা হয়ে গেলে, রহস্যটা আর রহস্য থাকে না, আজবও থাকে না। আমার বিশ্বাস, ওই চিৎকার ভূতে করেনি। এর পেছনেও কোন কারণ আছে। এবং শিগগিরই জানতে পারবো আমরা সেটা। ভূত ব্যাটাকে ধরতে পারলে···'

'পিটিয়ে তক্তা করবো ?' জ্যাকের কথায় ভয় অনেকখানি কেটে গেছে পিটারকিনের।

'তেমন বুঝলে পুড়িয়ে খেতেও ছাড়বো না,' ঠাট্টা করে বললো জ্যাক। 'চলো, ঘরে ফিরে যাই। কাল সকালেই আবার বেরোতে হবে।'

চিৎকারের ব্যাপারটা ভুলতে পারলাম না, যদিও ভয় কেটে গেছে অনেক। রাতে ভালোই ঘুম হলো।

ঝরঝরে দেহ-মন নিয়ে ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে। নাস্তা সেরে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসলাম। রাতে পরীক্ষা করে

দেখার সুযোগ পাইনি। কি বানিয়েছি, কতোখানি কাজের হয়েছে, বোঝা দরকার।

পাঁচ ফুট লম্বা এক ধনুক বানিয়েছে জ্যাক। দুটো তীর। সরু সোজা একটা চারাগাছ কেটে বারো ফুট লম্বা এক বল্লম বানিয়েছে পিটারকিন। মাথায় বেঁধেছে লোহার চোখা ফলা। দাঁড়ের মাথায় পাওয়া লোহার পাত থেকে ছুরি বানিয়েও খানিকটা অবশিষ্ট ছিলো, ওটাই কাজে লাগিয়েছে সে। নারকেলের গামছা ভাঁজ করে পুরু ফিতে বানিয়ে নিয়েছে জ্যাক। রবারের পরিবর্তে ওই ফিতে লাগিয়ে গুলতি বানিয়ে দিয়েছে আমাকে। আমি বানিয়েছি দুটো মুগুর। ঘুরিয়ে কায়দা করে বাড়ি মারতে পারলে বাঘের মাথাও ছাতু করে দেয়া যাবে।

চমৎকার সব অস্ত্রশস্ত্র। খাওয়া-দাওয়া শেষ। আর দেরি কেন? বেরিয়ে পড়তে চাইলাম।

বাধা দিলো জ্যাক। বললো, অস্ত্র বানিয়েছি বটে, কিন্তু ওগুলো কতোখানি কাজ করে, আমরা ব্যবহারই বা কতদূর করতে পারছি, জানা দরকার।

ব্যবহার করতে গিয়ে বুঝলাম, কতোখানি খাঁটি কথা বলছে জ্যাক। বিশবার ছুঁড়েও পাঁচ গজ দূরের নিশানায় একটা তীর লাগাতে পারলো না সে। তাছাড়া বেশি মোটা হয়ে গেছে ধনুকের গাছ। টেনে বাঁকা করাই মুশকিল। চেঁছে আরো সরু করে নিতে হবে।

পিটারকিনের বল্লম বেজায় ভারি। ওটাও সরু করতে হবে,

ওজন কমাতে হবে। তবে, ছোটো করতে রাজি হলো না সে। তার মতে, লম্বা বল্লমের অনেক সুবিধে।

আমার গুলতি বেশ ভালোই হয়েছে। তবে পাখিকে ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে পিটারকিন যতোখানি সই করতে পেরেছে, তার চেয়ে বেশি সুবিধে করতে পারলাম না আমি। আরো একটা ব্যাপার : পাখিকে ছোঁড়া ঢিল এসে লেগেছিলো আমার পায়ে, আমার ছোঁড়া গুলতির পাথর গিয়ে লাগলো পিটারকিনের টুপিতে। আরেকটু হলেই দিয়েছিলাম কপাল কাটিয়ে।

অবশেষে বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হলো, সেদিন বেরোতে পারছি না আমরা। আগে হাত সই করতে হবে, অস্ত্রগুলো ঠিকঠাক করতে হবে, তারপর অন্য কথা।

সারাটা দিন ব্যস্ত রইলাম আমরা। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলাম। তবে সন্তুষ্ট। আগামী কাল আর কোনো বাধা নেই। বেরোতে পারবোই।

এক ঘুমে পার করে দিলাম রাতটা।

এগারো

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো, তখন সূর্য উঠছে।

আগেই ঘুম ভেঙেছে জ্যাকের, আমি চোখ মেলতেই উঠে বসলো। ডেকে তুললো পিটারকিনকে। আজ আর সাঁতার কাটার সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে গোসল সেরে এলাম। নাস্তা সারতেও দেরি হলো না।

কাপড়চোপড় পরাই আছে। নারকেলের গামছা ভাঁজ করে বেল্ট বানিয়ে কোমরে আঁটলো জ্যাক। কুড়ালটা আটকে নিলো তাতে। হাতে তুলে নিলো ধনুক। আমাকে আর পিটার-কিনকেও ওরকম বেল্ট বানিয়ে নিতে বললো।

বানালাম। আমার মুগুর আর গুলতি ঝুলিয়ে নিলাম কোমরে। পিটারকিন তার মুগুর ঝোলালো। বল্লম তুলে নিলো কাঁধে।

সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। চমৎকার আবহাওয়া। সঙ্গে খাবার নেয়ার দরকার মনে করলাম না। সারা দ্বীপেই ছড়িয়ে আছে নারকেল গাছ। খিদে পেলে পেড়ে নিলেই হবে। ঝুনো নারকেল পাড়ারও দরকার পড়ে না, গাছের গোড়ায়ই

পড়ে থাকে। শুধু ডাব পাড়তে হয়। পিটারকিন তো সঙ্গে চলেছেই, সুতরাং অসুবিধে নেই। মনে করে টেলিস্কোপের কাচটা পকেটে নিলাম আমি। আগুন জ্বালানোর দরকার পড়তে পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটলাম আমরা। পাহাড়-জঙ্গল-সাগরে দেখার মতো অনেক কিছু আছে, দেখতে দেখতে চললাম। জাহাজ উপত্যকা পেরিয়ে এলাম। সৈকত ধরে এসে পড়লাম সেই জোড়া পাহাড়ের গোড়ায়। উপত্যকা ধরে এগিয়ে চললাম।

একটা মোড় নিয়েই থেমে গেল পিটারকিন। বল্লম তুলে একপাশে দেখালো। 'আরে, ওটা কি!'

দাঁড়িয়ে পড়লাম। শ'খানেক গজ দূরে পাথুরে একটা সমতল জায়গা। সাত-আট ফুট লম্বা একটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পঞ্চাশ গজের মধ্যেই সাগর। মাত্র এক মুহূর্ত। তারপরই ভেঙে পড়ে গেল থামটা। অবাক হয়ে গেলাম।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার আরেকটা থাম দেখা দিলো, আরেক জায়গায়। ভেঙে পড়লো। পরক্ষণেই আরেকটা দেখা দিলো, আগেরটার কাছেই। এটাও ভেঙে পড়লো। হঠাৎই বুঝে গেলাম ব্যাপারটা। ফোয়ারা। পাথরের মাঝে মাঝে গর্ত দিয়ে ছিটকে বেরোচ্ছে পানি। কিন্তু কারণটা কি? দেখতে চললাম।

কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলাম ওখানে। এবড়ো-খেবড়ো

জায়গা। অসংখ্য গর্ত। মাটি পাথর ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ কাছেই চাপা একটা শব্দ হলো। পরক্ষণেই হিস-হিস আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠিক পেছনের একটা গর্ত থেকে ছিটকে বেরোলো পানি, মোটা থামের আকারে। ভিজে গেল সারা শরীর। আমার কাছেই জ্যাক, সে-ও ভিজে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দুরবস্থা দেখে হেসে ফেললো পিটারকিন।

গর্তটার কাছ থেকে সরে এলাম। দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই পেছনের আরেকটা গর্ত থেকে পানি ছিটকে বেরোলো। আবার ভিজিয়ে দিলো আমাকে আর জ্যাককে। ব্যাপার দেখে পিটারকিন তো হেসেই খুন।

'দেখে শুনে পা ফেলো!' হাসতে হাসতে বললো পিটারকিন। 'নইলে আবার ভেজাবে। হাঃ হাঃ হাঃ...'

মাঝ পথেই আচমকা হাসি থেমে গেল। ঠিক তার পায়ের নিচ থেকে বেরিয়েছে পানি। পানির তোড়ে উল্টে পড়ে গেল পিটারকিন।

হাড়-টাড় ভেঙে গেল না তো। আমি আর জ্যাক ছুটলাম। গিয়ে ধরে তুললাম পিটারকিনকে। না, ভাঙেনি। তাড়াতাড়ি ওই জায়গা ছেড়ে সরে পড়লাম আমরা।

একটা শুকনো জায়গায় এসে গায়ের কাপড়চোপড় খুলে ফেললাম আমরা। আগুন জ্বেলে তাড়াহুড়ো করে শুকিয়ে

নিলাম। পরে নিলাম আবার।

সৈকতের দিকে রওনা হলাম। এই ফোয়ারার উৎপত্তির কারণ জানতে চাই।

পাথুরে জায়গাটা ঘুরে এসে দাঁড়ালাম সৈকতে। হঠাৎ খাড়া হয়ে নেমে গেছে এখানে সৈকত। প্রবল স্রোতে ভেঙে পড়া নদীর পাড়ের মতো দেখতে। বড় একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো তীরে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ছিটকে উঠলো ফোয়ারা, একটা, আরেকটা, তারপর আরেকটা। ব্যাপারটা অনুমান করে নিলাম। সাগর আর গর্তগুলোর যোগাযোগ আছে নিশ্চয় মাটির তলা দিয়ে। জোরালো ঢেউ আছড়ে পড়লেই ধাক্কা খেয়ে পানি ঢুকে পড়ে সরু সুড়ঙ্গগুলোতে। আর কোন পথ না পেয়ে গর্তের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরোয়।

সরে আসার কথা ভাবছি, হঠাৎ ডাকলো আমাকে জ্যাক। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আঙুল তুলে দেখালো জ্যাক। 'ওটা কি? হাঙর-টাঙর নয় তো?'

পাথুরে দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আছে একটা বড় পাথর। ওটার ওপর উঠে দাঁড়ালাম। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম নিচের দিকে। পানিতে হালকা সবুজ একটা কিছু নড়ছে, বড় মাছের লেজের মতো।

'কোনো মাছ-টাছ!' বললাম।

'পিটারকিন, তোমার বল্লমটা দাও তো,' বললো জ্যাক।

বল্লমটা নিয়ে খোঁচা মারলো সবুজ জীবটাকে। গাঁথলো না বল্লমে। আবার, আবার খোঁচা লাগালো জ্যাক। কিন্তু গাঁথতে পারলো না ওটাকে। আদৌ কোনো মাছ! নাকি অন্যকিছু! গাঁথছে না কেন! এতো খোঁচাখুঁচি হচ্ছে, কিন্তু লেজ নড়া থামছে না!

'অদ্ভুত তো!' বিড়বিড় করলো জ্যাক।

ওর সঙ্গে একমত হলাম আমি আর পিটারকিন। এতো খোঁচা মারা হল, ওটাকে গাঁথাও গেল না, জায়গা ছেড়েও গেল না!

যাত্রার শুরুতেই ওটার পিছনে আর সময় নষ্ট করতে চাইলাম না। এখনো প্রায় পুরো দ্বীপটাই দেখার বাকি আছে। চলে এলাম ওখান থেকে।

সবুজ জিনিসটার কথা কিছুতেই বের করতে পারলাম না মাথা থেকে। মনে মনে ঠিক করলাম, অদূর ভবিষ্যতেই ফিরে আসবো আবার এখানে। জানতেই হবে, ওটা কি!

বারো

ছোট্ট উপত্যকাটায় অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে গেলাম আমরা। কতগুলো তো খুবই দরকারী : গোল আলুর মতো এক ধরনের শেকড় এবং মিষ্টি আলু। এক ধরনের সব্জি চিনতে পারলো জ্যাক। দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপগুলোতে পাওয়া যায়। এর নাম, ট্যারো। প্রচুর পরিমাণে আলু আর সব্জি তুলে নিয়ে পকেট বোঝাই করলাম। রাতে রেঁধে খাওয়া যাবে।

সারাটা দিন ঘুরে বেড়ালাম আমরা। অনেক কিছু দেখলাম, অনেক কিছু আবিষ্কার করলাম। সূর্য ডোবার আগে আগে বন থেকে বেরোতে হবে। কাছেই সৈকত। ওখানেই রাত কাটাবো ঠিক করেছি। বনের ভেতর মশার বড় উৎপাত।

পড়ন্ত বিকেলের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে গাছ-পালার মাথায়। গাছে গাছে পাখির কলরব। বিচিত্র রঙের, বিচিত্র আকারের পাখি, হাজারে হাজারে। কটা দেখবো? উজ্জ্বল সবুজ, নীল, লাল, হলুদ এগুলো হলো প্রধান রঙ। এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক রঙের পাখি। হালকা ধূসর বন-কবুতরের ঝাঁক দেখে আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে।

গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে শেষে মেরেই ফেললাম একটাকে। অনেক দিন পর মাংসের ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাতের খাবারটা জমবে ভালো।

বনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ হলো মাথার ওপর। চমকে মুখ তুলে দেখি, বুনোহাঁসের ঝাঁক, তীরের ফলার আকারে উড়ে চলেছে। চেয়ে রইলাম। কোন্দিকে যাচ্ছে পাখিগুলো, দেখতে চাই। নামতে শুরু করলো। লক্ষ্য করে এগোলাম সেদিকে।

শিগগিরই ছোট্ট এক হ্রদের ধারে চলে এলাম। চারদিক ঘিরে আছে ছোটো ছোটো সবুজ গাছপালায়। পরিষ্কার নীল পানি, মস্ত এক আয়না যেন। গাছের ছায়া পড়েছে পানিতে, পাতার রঙ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ছায়া না বলে প্রতিবিম্ব বলাই ভালো।

হ্রদে নেমে পড়েছে হাঁসগুলো। ছুটোপুটি শুরু করে দিয়েছে। ওগুলোর মাঝে মাঝে আছে আরো কয়েক ধরনের জলচর পাখি। হাঁসের আগে আগেই তীরের দিকে রওনা হয়ে গেছে ওগুলো। পানি এসে গেল জিভে। ইস্, যদি অন্তত একটা হাঁস ধরতে পারতাম।

পিটারকিনকে সৈকতে পাঠিয়ে দিলো জ্যাক। আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়ে দিলো। আমাকে নিয়ে রওনা হল হ্রদের আরেক পাড়ে। ওদিকেই যাচ্ছে পাখিগুলো। রাতের অন্ধকারে এক-আধটা ধরার চেষ্টা করা যেতে

পারে।

কোথায় যে লুকিয়ে পড়েছে পাখিগুলো, অনেক খুঁজেও বের করতে পারলাম না। পুরো আধ ঘণ্টা খামোকাই নষ্ট করলাম। ধরা তো দূরের কথা, হাঁসের হদিসই পেলাম না।

হতাশ হয়ে ফিরে চললাম। খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে মাত্র দশ গজ দূরে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বিশাল এক গাছ। কাণ্ডের শেষ মাথা থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ডাল, প্রায় প্রতিটাই পাঁচ ফুটের মতো লম্বা। বড় বড় পাতায় ঢাকা। বিরাট এক ছাতার মতো দেখতে লাগছে। ডালে ডালে ঝুলছে এক ধরনের উজ্জ্বল হলুদ ফল। ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে ডালগুলো। গাছের গোড়ায় বিছিয়ে আছে পাকা ফল। ওগুলো খেতেই এসেছে বোধ হয় প্রাণীগুলো। গাছটাকে ঘিরে এখন ঘুমাচ্ছে। মাদী-মদ্দা, বুড়ো-ধাড়ি, বাচ্চায় মিলে কুড়িখানেকের কম না। বুনো শুয়োর।

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে জ্যাকের। 'রালফ!' ফিস-ফিস করে বললো সে। 'গুলতিতে পাথর পরাও। ওই যে, হোঁৎকা একটা মদ্দা শুয়ে আছে, ওটার নাক সই করবে। আমি দেখি, এধারের একটি বাচ্চার গায়ে তীর বেঁধানো যায় কিনা!'

'জাগিয়ে নিলে ভালো হতো না?' ফিসফিস করে বললাম। 'ঘুমের মধ্যেই মেরে ফেলবো, কাজটা উচিৎ হবে?'

'শিকারের উদ্দেশ্যে শিকার করলে হতো না,' বললো জ্যাক। 'কিন্তু মাংসের জন্যে মারছি আমরা, খাবার জন্যে। তাছাড়া,

আমাদের কাছে যেসব অস্ত্র, এগুলো দিয়ে মরবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে! নাও, এখন···মারো!'

নাকে লাগাতে পারলাম না। তবে পুরোপুরি মিসও করলাম না। ছুপ্‌প্‌ করে গিয়ে শুয়োরটার পেটে লাগলো পাথর। চমকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রাণীটা। তীক্ষ্ণ এক ডাক ছেড়েই ছুটে পালালো। কিছুই হয়নি। জ্যাকের তীরও ছুটে গেছে। সে-ও জায়গামতো লাগাতে পারেনি। কানে ঢুকে আটকে গেছে তীরের ফলা। ঝুলছে। আর্তনাদ করে উঠলো বাচ্চাটা।

'আমিও মিস করেছি!' চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক। কুড়াল বাগিয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে।

ঝাড়া দিয়ে কান থেকে তীর খুলে ফেলার চেষ্টা করলো শুয়োরের বাচ্চা। পারলো না। শেষে ওটা নিয়েই ছুট লাগালো দলের পেছনে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন ঝোপের ভেতরে। দলটার ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে পালানোর আওয়াজ কানে এলো খানিকক্ষণ। তারপর সব চুপচাপ।

'দুর্‌র্‌! কোনো কাজই হলো না!' নাক চুলকাচ্ছে জ্যাক।

'নাহ্‌!' আমিও হতাশ।

'চলো, যাই। দেখি, পিটারকিন কতোখানি কি করেছে! দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই।'

নীরবে এগিয়ে চললাম আমরা। বন পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম খোলা সৈকতে।

আগুন দেখতে পেলাম, কিন্তু আশেপাশে কোথাও নেই পিটারকিন। গেল কোথায়! অবাক চোখে তাকালাম এদিক ওদিক।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কানে এলো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পরক্ষণেই আনন্দিত চিৎকার।

'পিটারকিন! চলো তো দেখি কি হয়েছে!' বলে উঠলাম।

আমি আর জ্যাক পা বাড়ানোর আগেই শোনা গেল পিটারকিনের গলা। বন থেকে বেরিয়ে আসছে। 'কেল্লা ফতে!'

এগিয়ে গেলাম। বল্লমটা পিটারকিনের কাঁধে। ফলায় গাঁথা শুয়োরের বাচ্চা। মৃত।

'দেখো, জ্যাক,' কাছে এসে বললো পিটারকিন। 'বাচ্চাটার কানে ফুটো। এই তীরটা চিনতে পারো?'

জ্যাকের তীর। ওই বাচ্চাটার কানই ফুটো করেছিলো সে।

দারুণ জমবে রাতের খাবার। কাজে লেগে গেলাম আমরা।

'যা ফাস্ট ক্লাস কাবাব হবে না!' আগুনে ঝলসাচ্ছে আস্ত বন কবুতর, সেদিকে চেয়ে বললো পিটারকিন। 'রালফ, একটু নজর রেখো। আমি আসছি। জ্যাক, তোমার কুড়ালটা দাও তো।'

অবাক লাগলো। কুড়াল নিয়ে কোথায় যাবে পিটারকিন।

যেখান থেকে শুয়োরের বাচ্চাটা নিয়ে বেরিয়েছিলো সেখানেই আবার গিয়ে ঢুকলো পিটারকিন। কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে এলো আবার। হাতে গোটা ছয়েক মোটা লম্বা আখ।

সপ্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকালাম আমি আর জ্যাক।

'আরো আছে,' বললো পিটারকিন। 'ছোটোখাটো এক ক্ষেত। মানুষেই লাগিয়েছে মনে হলো।'

'হতে পারে,' সায় দিয়ে বললো জ্যাক। 'মানুষ ছিলো এদ্বীপে, এটা তো জানা কথাই।' বাচ্চাটা কাটতে বসলো সে।

লোহার পাতে বানানো ছুরি দিয়ে ছাল ছাড়ালো জ্যাক। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে আলাদা করে ফেললো চারটে পা। একটা রান তুলে নিয়ে ধুয়ে আনলো। চোখা একটা ডাল ঢুকিয়ে দিলো মাংসের ভেতর। তারপর ওটা ধরলো আগুনের ওপর। 'পিটারকিন, কাজই করেছো একটা! জানলে কি করে, শুয়োরকে তীর মেরেছি?'

'শুয়োরের চেঁচামেচি শুনলাম। চোখ তুলে দেখি, বন থেকে বেরিয়ে আসছে একটা দল। বল্লম নিয়ে তাড়া করলাম। এই বাচ্চাটা চোখে পড়লো, কানে তীর। ওটার পেছনেই লাগলাম। আখ ক্ষেতে গিয়ে সেঁধোলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল। ভাবখানা, মস্ত এক ফাঁকি দিয়েছে আমাকে। আমিও যেন দেখিনি, পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। পেছন থেকে মারলাম, ঘ্যাঁচ করে গেঁথে ফেললাম বল্লম দিয়ে।'

চমৎকার কাবাব তৈরি হলো। সাগরের লবণপানি থেকে

ভিজিয়ে আনা হয়েছে রান্না করার আগে। কাজেই নুনছাড়া মনে হবে না।

আলু আর ট্যারোও সেদ্ধ করা গেল। বালিতে ছোটো একটা গর্ত করলো জ্যাক। তাতে ভরলো কিছু আলু আর সব্জি, চ্যাপ্টা একটা ছোটো পাথর দিয়ে ঢেকে দিলো গর্তের মুখ। ওপরে ডাল-পাতা ফেলে আগুন জ্বেলে দিলো। গর্তে আবদ্ধ থেকে ভাপে সেদ্ধ হয়ে গেল তরকারি।

খেতে বসে গেলাম।

'জাহাজেও এতো ভালো খাবার খাইনি!' মন্তব্য করলো জ্যাক।

'ঠিক,' মুখ ভর্তি মাংস চিবোতে চিবোতে বললো পিটারকিন।

আস্ত এক আলু মুখে পুরে দিয়েছি। গরম। কথাই বলতে পারলাম না। কোনোমতে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় জানালাম।

'বেশিদিন এখানে থাকলে,' পিটারকিন বললো, 'খাওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারবো না।'

'এখনই কি পারছো?' প্রশ্ন করে বসলো জ্যাক।

জবাব দিলো না পিটারকিন। বড় এক টুকরো মাংস পুরে দিয়েছে মুখে।

'অনেকদিন পর যা একখানা খাওয়া হলো না!' খাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুলে বললাম।

এইবার শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই বড় একটা

পাথরের টিলা। ওপরের দিকে কার্নিশের মতো বেরিয়ে আছে পাথর। নিচে বালি। পুরু করে পাতা বিছিয়ে নিলাম বালিতে। শুয়ে পড়লাম।

সারাদিন পরিশ্রম গেছে, এখন বোঝাই পেট। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তেরো

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো। অনেকখানি উঠে এসেছে সূর্য। কথাটা আগে কেবল শুনেছি, আজ জানলাম, বেশি খেলে ঘুম বেশি হয়। ভোরে ওঠাই মুশকিল। তবে শরীরটা একেবারে ঝরঝরে লাগছে আমাদের। খিদেও পেয়েছে। অভ্যাসমতো সাঁতার কাটতে গেলাম। ফিরে এসে নাস্তা সেরে নিলাম। তারপর তৈরি হলাম অভিযান চালিয়ে যেতে।

মাইলখানেকও হাঁটিনি, হঠাৎ কানে এলো চিৎকার। এর আগেও শুনেছি দু'বার, সেই রাতে। কর্কশ, গাধার ডাকের মতো।

'কি ওটা!' জ্যাকের দিকে ফিরলো পিটারকিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

পিটারকিনের কথার জবাব দিতেই যেন আবার চিৎকার শোনা গেল। আরো জোরে।

'ওই দ্বীপগুলোর কোনোটা থেকে আসছে,' প্রবাল প্রাচীরের বাইরের কয়েকটা দ্বীপ দেখিয়ে বললো জ্যাক।

'ভূত ছাড়া আর কিছু না!' বললো পিটারকিন। 'জ্যান্ত

কোনো প্রাণীকে ওভাবে চেঁচাতে শুনিনি কখনো !'

'চলো তো দেখি,' বলে হাঁটতে শুরু করলো জ্যাক।

খানিকটা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লাম। সবচেয়ে বড় দ্বীপটায় অদ্ভুত কয়েকটা জীব নড়াচড়া করছে, সৈকতে, একেবারে পানির ধারে।

'আরে ! সৈন্য মনে হচ্ছে !' পিটারকিনের চোখে বিস্ময়।

আমারও তাই মনে হলো। একদল সৈন্য, তিনভাগে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে : ক্রস, সরল রেখা এবং চতুর্ভুজ তৈরি করেছে ! একই রঙের পোশাক পরেছে সবাই : কোট আর শাদা প্যান্ট। ওদের দিকে চেয়ে আছি, এই সময় আবার শোনা গেল চিৎকার আর কোন সন্দেহ নেই, সাগর পেরিয়ে সেনাবাহিনীর কাছ থেকেই আসছে। ডাঙার ওপর দিয়ে যতটা না পানির ওপর দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি দূরে পৌঁছুতে পারে শব্দ।

'নরখাদকদের মারার জন্য পাঠানো হয়েছে সেনাবাহিনী,' মন্তব্য করলো পিটারকিন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে দেখতে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো। 'কোথায় ভূত, কোথায় সৈন্য আর কোথায় পেঙ্গুইন ! হা-হা-হা !'

'পেঙ্গুইন !' পিটারকিন অবাক।

'তাই-তো। পেঙ্গুইন। সাগরের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা এক জাতের পাখি। সামনা-সামনিই দেখতে পাবে একদিন। দাঁড়াও, আগে নৌকাটা বানিয়ে নিই, তারপর গিয়ে উঠবো ওই

দ্বীপে।'

'হায়রে! এই আমাদের রক্তপিপাসু ভূত! চলো চলো জলদি বাড়ি ফিরে যাই। নইলে আরো কতো অদ্ভুত কাণ্ড দেখবো. কে জানে!' বললো পিটারকিন।

কিন্তু বাড়ি ফিরে গেলাম না আমরা। দ্বীপের সবটা না দেখে ফেরার ইচ্ছে নেই।

সেদিন সারাটা দিন হাঁটলাম আমরা। নতুন আর কিছুই চোখে পড়লো না। তবে পরের দিন ভোরে এমন একটা জিনিস দেখলাম, মনটাই ভারি হয়ে গেল।

সেদিন সকালে, ঘুম থেকে উঠে সাঁতার কেটে এসে, নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা এগোতেই বালিতে ছোটো একটা জানোয়ারের পায়ের ছাপ চোখে পড়লো। পিটারকিনের ধারণা, কুকুর। কিন্তু আমি আর জ্যাক একমত হতে পারলাম না। তবে কিসের পায়ের ছাপ, তা-ও বুঝতে পারলাম না। তাজা ছাপ। শেষে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে চললাম।

বালি পেরিয়ে এলাম। সামনে এবড়ো-খেবড়ো মাটি, ঘাস নেই খানিকটা জায়গায়। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে জীবটা। কালো একটা বেড়াল।

'বনবেড়াল!' ফিসফিস করে বললো জ্যাক। দ্রুত তীর পরালো ধনুকে। তাড়াহুড়ো করে ছুঁড়তে গিয়ে ব্যর্থ হলো নিশানা। জানোয়ারটার আধ ফুট দূরে মাটিতে গিয়ে বিঁধলো তীর। আশ্চর্য! লাফিয়ে উঠে ছুট তো লাগালোই না, এগিয়ে

এসে তীরটাকে শুঁকতে লাগলো বেড়ালটা।

'তাজ্জব ব্যাপার! এমন বনবেড়াল তো দেখিনি!' কোমর থেকে কুড়াল খুলে নিয়ে এগোলো জ্যাক।

'দাঁড়াও দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে বাধা দিলাম ওকে। 'আমার মনে হচ্ছে, বেড়ালটা কানা। দেখছো না, কেমন রোম উঠে গেছে! বুড়ো হয়ে গেছে ওটা!'

ঠিকই। কানা তো বটেই, বধিরও হতভাগা জীবটা। শুধু ঘ্রাণশক্তির ওপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে এখনো।

বেড়ালটাকে ঘিরে দাঁড়ালাম আমরা।

'আহা, বেচারা!' তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করলো পিটারকিন। বসে পরে হাত রাখলো বেড়ালটার গায়ে। লেজ খাড়া করে ফেললো ওটা। মিঁউ মিঁউ ডেকে উঠলো বিষণ্ণ গলায়। তারপর এগিয়ে এসে তার পায়ে গা ঘষতে লাগলো।

'পুষি! পুষি! আমার চেয়ে বুনো না!' ঘোষণা করলো পিটারকিন। দু'হাতে তুলে নিলো বেড়ালটাকে।

'কারো পোষা!'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে বেড়ালটা। পিটারকিনের গালে মাথা ঘষলো, চিবুক চেটে দিলো, তারপর মুখ লুকালো তার কাঁধে। একটানা গরগর আওয়াজ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে।

কার বেড়াল ওটা? কে আনলো? অনেক বয়েস হয়েছে জীবটার। যে-ই এনে থাকুক, নিশ্চয় অনেক বছর আগে এনেছে।

এই আবিষ্কারে উত্তেজিত হয়ে পড়লাম আমরা। আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম জ্যাকের কথায়। সামনের দিকে চেয়ে বলে উঠলো সে, 'গাছের গুঁড়িগুলো দেখেছো? কুড়াল দিয়ে কাটা হয়েছে। চলো কাছে থেকে দেখি।'

খোলা জায়গাটার পরেই বন শুরু হয়েছে। এক জায়গায় অনেকগুলো গাছ কাটা, গুঁড়িগুলো শুধু মরা শেকড় গেড়ে আছে মাটিতে। নিশ্চয় বেশ কয়েক বছর আগে কাটা হয়েছে। শেওলায় ঢেকে আছে। কাছেপিঠে মানুষের পায়ের ছাপ চোখে পড়লো না। কিন্তু গুঁড়িগুলোর পাশের নরম মাটিতে বেড়ালের পায়ের অসংখ্য ছাপ। পিটারকিনের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন ওটা।

জ্যাককে অনুসরণ করে এগোলাম। গজ দশেক পরেই একটা গভীর নালা, গাছ ফেলে পুল তৈরি করা হয়েছে। পারাপারের ব্যবস্থা। পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। পুল পেরোলাম। প্রতিটি পা ফেলছি, আর মনে হচ্ছে, এই বুঝি আজব কিছু চোখে পড়লো!

চোখে পড়লো শিগগিরই। একটা ছোট্ট কুঁড়ে। ধ্বংসের শেষ অবস্থায় রয়েছে। শেওলায় ঢেকে গেছে কাঠের বেড়া, পাতার চাল। অনবরত রোদ-বৃষ্টি আর অযত্নের কারণে পচে গেছে। ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে, এই অবস্থা। চারপাশে গজিয়ে আছে লম্বা লম্বা ঘাস। দরজা বন্ধ। এগিয়ে গিয়ে আলতো করে ঠেলা দিলো জ্যাক। ভোঁতা একটা শব্দ তুলে খসে পড়ে গেল দরজা। ভেতরে পা রাখলাম আমরা।

ঘরের এক কোণে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। দুরুদুরু

করে উঠলো বুকের ভেতর। কাঠের নিচু একটা চৌকি। এককালে ঘাসপাতার বিছানা হয়তো ছিলো, এখনো তার চিহ্ন পড়ে আছে। তার ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের কংকাল। কংকালটার বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে আরেকটা কংকাল। কুকুরের। প্রভুর বুকের ওপর শুয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে প্রভুভক্ত জীবটা!

নিজের অজান্তেই চোখের কোণে পানি দেখা দিলো আমাদের। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামার আগেই মুছে ফেললাম। জ্যাকও তাই করলো। পিটারকিনের কোলে বেড়াল, দাঁড়িয়ে রইলো সে চুপচাপ। জীবটার ঘুম নষ্ট করতে চাইলো না।

ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমরা। কে এই লোক, কোথা থেকে এলো, জানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, কোনো রকম ডাইরি নেই। কোথায়ও কোনো কিছু লেখা নেই। রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল। চৌকির পাশে শুধু একটা কুড়াল পাওয়া গেল। পুরোনো। মরচে ধরে গেছে ফলায়।

পাহাড়ের ঢালে গাছ কেটেছিলো নিশ্চয় ওই লোকই। তাতে নামের আদ্যাক্ষর লিখেছিলো। আখের ক্ষেত করেছিলো হয়তো ও-ই। দ্বীপের এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে তারই চিহ্ন।

'এসো, যাই!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো পিটারকিন।

নীরবে বেরিয়ে এলাম আমরা কুঁড়ে থেকে। বেরোনোর সময় দরজার এক পাশের চৌকাঠে জ্যাকের কাঁধের ধাক্কা লাগলো। ওতেই খসে পড়ে গেল চৌকাঠ। দেবে গেল দরজার ওপরের

চাল।

বাইরে বেরিয়ে ফিরে তাকালো জ্যাক। আমাকে বললো, 'এসো, ঘরটা ফেলে দিই। ওই মানুষ আর তার কুকুরটার কবর হয়ে যাক।'

রাজি হলাম। মোটেই পরিশ্রম করতে হল না। খুঁটিগুলোতে কুড়ালের একটা করে কোপ। ব্যস, ধসে বসে গেল বেড়া আর চাল। বিশ্বস্ত বন্ধুকে বুকে নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাক এখন ওর তলায় হতভাগা, অচেনা মানুষটা।

মন খারাপ হয়ে গেছে। আর দ্বীপে ঘুরতে ইচ্ছে হলো না। বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কোলে বেড়াল, একনাগাড়ে নিঃশব্দে কাঁদছে পিটারকিন। আমি আর জ্যাকও নীরব। বিকেল নাগাদ ফিরে এলাম জাহাজ উপত্যকায়। কুঁড়েতে ঢুকে দেখলাম, তিন দিন আগে যেটা যেখানে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি রয়েছে।

রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। রাতে বিশেষ কিছু মুখে তুলতে পারলাম না। গড়িয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু ঘুম এলো না কারো চোখেই। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করে কাটালাম আমরা। তার বেশির ভাগই, রহস্যময় মানুষটা আর তার দুই সঙ্গী কুকুর-বেড়াল নিয়ে। তারপর কখন চোখ লেগে এলো বলতে পারবো না।

পরদিন ঘুম ভাঙলো বেলা করে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করলো না, খেতে ইচ্ছে হলো না। শরীরে জড়তা, চোখে এখনো ঘুম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুপুরের পর উঠলাম আমরা। সাঁতার কেটে এসে খাওয়া সারলাম। চাঙ্গা হয়ে উঠলো আবার দেহমন। সেদিন কোনো কাজই করলাম না। কুঁড়ের বাইরে বসে আলাপ-আলোচনা করে, আর সাগর দেখে কাটালাম। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম সকাল সকাল। ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে, সূর্য উঠার অনেক পরে।

চোদ্দ

পরের তিনটে হপ্তা নৌকা বানানো নিয়ে ব্যস্ত রইলাম আমরা। পেঙ্গুইন দ্বীপে যাবো।

বেশির ভাগ কাজ আসলে জ্যাকই করে। আমি মাঝেমধ্যে ওকে সাহায্য করি। এছাড়া বাকি সময়টা কাটাই আমার অ্যাকোয়ারিয়ামের জলজ প্রাণী নিরীক্ষণ করে। এটা এখন নেশা হয়ে গেছে আমার। সঙ্গে রাখি আতস কাচ। ওর ভেতর দিয়ে দেখি ছোটো ছোটো জীবগুলোকে। আমার অ্যাকোয়ারিয়ামের অদ্ভুত কয়েকটা জীবের কথা বলছি :

কাঠির মতো কিছু লাল, সবুজ, হলুদ জীব আছে, ওগুলো অ্যাকোরিয়ামের তলা কামড়ে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ছোটো কোনো মাছ বা প্রাণী ওদের সীমানায় ঢুকলেই খেল। বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন জীবগুলোর শরীরে। শুঁড়ের মতো অসংখ্য হাত বেরিয়ে এসে আঁকড়ে ধরে শিকারকে। কাঠির মাথার দিকটায় গর্ত দেখা দেয়, ওটা মুখ। নিমেষে কাবু করে গিলে ফেলে শিকারকে।

আছে কোরাল পলিপস্। যেগুলোর একটানা পরিশ্রম আর কাজের ফলেই গড়ে উঠেছে প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য প্রবাল

দ্বীপ আর প্রাচীর। কি বিচিত্র তাদের রঙ আর কাজের পদ্ধতি! গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে দুলতে থাকে লম্বা জলজ শেওলার মতো, চেনা না থাকলে যে কেউ উদ্ভিদ বলে ভুল করবে ওগুলোকে।

বেশ কয়েক ধরনের শামুক রেখেছি অ্যাকোয়ারিয়ামে। বিচিত্র আকার, বিচিত্র রঙ। খিদে পেলে পিঠের কাছে একটা ঢাকনা সরে যায়। বেরিয়ে আসে পাতলা সুতোর মতো হাত। খাবার টেনে নিয়ে গিয়ে মুখে পোরে। সে মুখ ভারি অদ্ভুত দেখতে!

আর রেখেছি কয়েক ধরনের কাঁকড়া। নিজেদের কোনো খোলস নেই। ছোটো বেলায় অন্য কোনো মরা শামুকের খোলসে ঢুকে পড়ে। ওটা নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। বড় হতে হতে যদি ওই খোলসে আর জায়গা না হয়, বেরিয়ে বড় আরেকটা খোলসে ঢোকে।

তবে আমার সংগ্রহের সব চেয়ে আজব জীব—নাম জানি না, অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে ওগুলোর। অসুস্থ হয়ে পড়লেই ভেতরের দাঁত আর পেটের ভেতরের সব যন্ত্রপাতি খুলে ফেলে দেয়। কয়েক মাসের মধ্যেই আবার নতুন যন্ত্রপাতি এবং দাঁত গজিয়ে যায়।

আরো অনেক অদ্ভুত জীব রেখেছি আমি অ্যাকোয়ারিয়ামে। আতস কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে দেখতে সময় যে কোথা দিয়ে পেরিয়ে যায়, খেয়ালই থাকে না।

নৌকা তৈরির কাজ চলছে। পুরো তিনটে হপ্তা জাহাজ-উপত্যকা থেকে দূরে কোথাও যাইনি।

'নতুন কিছু একটা করা দরকার,' প্রস্তাব রাখলো পিটার-

কিন। 'নৌকা নিয়ে ঠুকঠাক করে করে বিরক্ত হয়ে পড়েছি! চলো না, হাঁস কিংবা শুয়োর শিকারে বেরোই? উফ্‌ফ্‌, একেবারে ঝিম ধরে গেছে শরীরে!'

'এক কাজ করলেই পারো,' হাত থেকে কুড়ালটা বালিতে ফেলে দিয়ে বললো জ্যাক, 'ফোয়ারাগুলোর কাছে চলে যাও। পানির খামে চড়ে শূন্যে উঠে পড়বে। তারপর, পাথরে আছড়ে পড়লেই ঝিমানি চলে যাবে শরীরের।'

হেসে উঠলাম আমি। পিটারকিনও হাসলো।

'ও কিন্তু ঠিকই বলেছে, জ্যাক,' বললাম, 'সত্যিই চেঞ্জ দরকার আমাদের। গায়েগতরে ঘুণ ধরে গেছে যেন! এক কাজ করি চলো, ফোয়ারাগুলোর কাছেই যাই। ওই যে সবুজ জিনিসটা, ওটা এখনো আছে কিনা দেখি, চলো।'

'আমি জানি ওটা কি?' বলে উঠলো পিটারকিন।

'কি?' ভুরু কোঁচকালাম।

'অদ্ভুত কোনো কিছু,' বলেই উঠে পড়লো পিটারকিন। পিছিয়ে গেল কয়েক কদম আমার দিকে চেয়ে। হাসলো। কোমরে বেল্ট এঁটে তাতে ঝুলিয়ে নিলো মুগুরটা।

'বেশ, তাহলে ফোয়ারা উপত্যকায়ই যাই, চলো,' বললো জ্যাক। 'খোকাবাবুকে নাগরদোলা চড়িয়ে আনি।' কুঁড়ের ভেতরে গিয়ে তীর-ধনুক বের করে আনলো সে। 'পিটারকিন, তোমার বল্লমটা নিও।'

রওনা হলাম আমরা। পথ চেনাই আছে। শিগগিরই পৌঁছে

গেলাম ফোয়ারা উপত্যকায়। প্রথমেই চলে এলাম পানির ধারে। দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে থাকা সেই পাথরটায় উঠলাম। আশ্চর্য! আছে! ঠিক তেমনি লেজ নাড়ছে সবুজ···কি বলবো ওটাকে? হ্যাঁ, প্রাণীই বলি। হাঙর নয়, এ—ব্যাপারে এখন নিশ্চিত। এক জায়গায় এতোদিন এভাবে থেমে থাকে না হাঙর।

নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম ওটার দিকে তিনজনেই।

শেষে পিটারকিন বললো, 'বল্লম দিয়ে গেঁথে ফেলবো। হৃৎপিণ্ডে গাঁথবো, যদি থেকে থাকে।'

'গাঁথো,' বললো জ্যাক।

বল্লম তুলে ধরলো পিটারকিন। নিশানা করলো। তারপর নামিয়ে আনলো ঝটকা দিয়ে। ঠিক সবুজ প্রাণীটার ভেতর দিয়ে চলে গেল বল্লমের ফলা। টান দিলো পিটারকিন। আশা করেছিলো জোর লাগবে, কিছুই লাগলো না। পানিতে ঢুকে যেন বেরিয়ে এলো বল্লম। এক বিন্দু এদিক ওদিক হয়নি, সেই আগের মতোই লেজ নাড়ছে প্রাণীটা।

'ব্যাটার হৃৎপিণ্ড নেই!' হতাশ হয়েছে পিটারকিন। 'আর কিছুই করার নেই আমার।'

'এখন কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে আমার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো জ্যাক। 'হয়তো ওটা আলোর কারসাজী। নইলে একই জায়গায় একই রকম ভাবে রয়ে যাচ্ছে···!'

'এক কাজ করলেই তো পারি,' প্রস্তাব রাখলাম। 'চলো, ডুব দিয়ে গিয়ে দেখে আসি।'

'ঠিক, ঠিক কথা,' দুই আঙুলে তুড়ি বাজালো জ্যাক। 'রালফ, তুমি থাকো। আগে আমি যাই।' কাপড় খুলতে শুরু করলো সে। 'তোমার চেয়ে আমি ভালো ডুবুরি। তাছাড়া দুজনে একসঙ্গে বিপদে পড়ার কোনো মানে হয় না।'

আমি কিছু বলার আগেই দু'হাত মাথার ওপরে তুলে শরীর বাঁকা করে ঝাঁপ দিলো জ্যাক। ঝপাং করে গিয়ে পড়লো পানিতে। দু-এক সেকেণ্ডের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সবুজ প্রাণীটা। জ্যাকের পতনের ফলে পানিতে তোলপাড় উঠেছে। শান্ত হয়ে এলো আবার পানি। দেখলাম, নেমে যাচ্ছে জ্যাকের মাথা, সবুজের ঠিক মাঝখান দিয়ে। নামতে নামতে হঠাৎ করেই আর দেখা গেল না জ্যাককে।

উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছি। আশা করছি, যে কোনো মুহূর্তে দেখা যাবে জ্যাকের মাথা। নিশ্বাস নিতে ভেসে উঠতেই হবে তাকে।

অনুমান করলাম, এক মিনিট পেরিয়েছে। দুই মিনিট! উঠলো না জ্যাক। শংকিত হয়ে উঠলাম। এক মিনিটের বেশি দম রাখতে পারে না সে।

'পিটারকিন!' চেঁচিয়ে উঠলাম হঠাৎ। 'কমপক্ষে তিন মিনিট হয়ে গেছে! নিশ্চয় কিছু হয়েছে জ্যাকের!'

দ্রুত হাতে কাপড় খুলতে লাগলাম। আর দেরি করতে চাই না। ঝাঁপ দিতে যাবো এই সময় দেখা গেল কালো মাথাটা। সবুজের ভেতর দিয়ে উঠে আসছে দ্রুত।

ভুসস করে পানির ওপর ভেসে উঠলো জ্যাকের মাথা। অবাক হয়ে দেখলাম, কোনো ক্ষতিই হয়নি তার। এক হাতে চুলের পানি ঝেড়ে ফেলে হাসলো আমাদের দিকে চেয়ে। কিন্তু এতোক্ষণ ও পানির তলায় দম বন্ধ রাখলো কি করে!

পাথরের দেয়ালে অসংখ্য খাঁজ। তাছাড়া ছোটো ছোটো পাথর ঠেলে বেরিয়ে আছে এখানে ওখানে। উঠে আসতে অসুবিধে হলো না জ্যাকের। হাঁপাচ্ছে। এক লাফে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো পিটারকিন। কেঁদে ফেললো।

'জ্যাক, কোথায় ছিলে তুমি?···কি করেছো এতোক্ষণ?···কিছু হয়েছে?' একনাগাড়ে প্রশ্ন করে গেল পিটারকিন।

আমাদেরকে শান্ত হওয়ার সময় দিলো জ্যাক। তারপর বললো, 'ওটা হাঙর নয়। যা বলেছিলাম, আলোর কারসাজি।'

পনেরো

খুলে বললো সব জ্যাক।

'ডুব দিয়েই বুঝলাম, পাথরের একটা গর্ত থেকে আসছে আলো। তেরছা হয়ে। সাঁতরে গর্তের কাছে গেলাম। দেখি, একটা সুড়ঙ্গ। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম, যাবো কি যাবো না। শেষে, যা থাকে কপালে ভেবে ঢুকেই পড়লাম। সাঁতরে চললাম সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। ফুরায় না আর। ফিরে আসার কথা ভাবছি, এই সময়ই মাথার ওপরে আলো দেখতে পেলাম। খেয়াল করে দেখলাম, সুড়ঙ্গ শেষ। ওপরের দিকে উঠে গেলাম। পানির ওপরে ভেসে উঠলো মাথা। পরিষ্কার ব.ত.স। প্রথমে কিছুই চোখে পড়লো না, আবছা অন্ধকার। চোখে সয়ে আসতেই দেখলাম, বিরাট এক গুহায় ঢুকেছি। গুহার শেষ মাথা অন্ধকার, কিন্তু ছাত উজ্জ্বল। হীরের মতো জ্বলছে। অপরূপ দৃশ্য। ভালো করে দেখার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তোমরা ভাবনা-চিন্তা করবে, তাই চলে এসেছি।' এক সঙ্গে অনেক কথা বলে থামলো জ্যাক।

আমার আর তর সইলো না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে।

গুহায় পৌঁছুতে অসুবিধে হলো না। অন্ধকার গুহা। তেমন

কিছুই চোখে পড়লো না। কেবল মাথার ওপরে অদ্ভুত আলো। কেমন জ্বল জ্বল করছে। আলো ছাড়া দেখা যাবে না ভালোমতো গুহাটা। ফিরে এলাম। উচ্ছ্বসিত হয়ে সব শোনালাম পিটারকিনকে।

মুখ কালো করে ফেললো পিটারকিন।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলাম। 'হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল?'

'আর কি! তোমরা দুজনেই গিয়ে দেখে এলে। পরীর দেশ ঘুরে এসেছো যেন। অথচ আমার যাবার উপায় নেই। আমার যাবার ক্ষমতাই নেই।'

'সত্যি, খারাপই লাগছে!' বললো জ্যাক। 'কিন্তু কোনো সাহায্যই করতে পারছি না তোমাকে। খালি যদি ডুবসাঁতার জানতে...'

'তার চেয়ে আকাশে ওড়া অনেক সহজ মনে হয় আমার কাছে!' ভগ্ন গলায় বললো পিটারকিন।

হাসলাম।

গুহাটা ভাল করে দেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলো। কিন্তু আলো ছাড়া গিয়ে কোনো লাভ নেই। এটা একটা সমস্যা। কি করে আলো নিয়ে যাই?

ভেবেচিন্তে উপায় একটা বের করে ফেললাম। গাছের শুকনো বাকল ভালো করে জড়িয়ে নিলাম নারকেলের গামছায়। কিছু শুকনো ঘাস আর একটা শক্ত শুকনো কাঠি নারকেলের গামছায় জড়িয়ে পোটলা বাঁধলাম। ছোটো একটা ধনুক বানালো জ্যাক।

ওটাও পেঁচিয়ে নিলো নারকেলের গামছা দিয়ে। পানিতে ভিজবে না এখন আর জিনিসগুলো। গুহার ভেতরে মশাল জ্বালাতে পারবো।

'আমাদের জন্যে ভেবো না, পিটারকিন,' নরম গলায় বললো জ্যাক। 'শিগগিরই ফিরে আসবো। বড়জোর আধঘন্টা।'

'যাই, পিটারকিন,' বললাম।

'এসো। নিজেদের দিকে খেয়াল রেখো।'

জ্যাকের পর পরই ঝাঁপ দিলাম আমি।

ডুব দিয়ে সাঁতরে এসে ঢুকলাম গুহার ভেতরে, কোনো অসুবিধে হলো না। চোখে আবছা অন্ধকার সয়ে আসতেই চলে এলাম এক পাশের একটা পাথুরে তাকের কাছে। উঠে বসলাম তাতে। শুকনো বাকলের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে নিলাম। চোখে এসে ধাক্কা মারলো যেন অপরূপ সৌন্দর্য।

মাথার ওপরে দশ ফুট উঁচু ছাত। প্রবালে তৈরি। দাঁড়িয়ে আছে প্রবালের বড় বড় থামের ওপর ভর করে। লাল-শাদা রঙের বাহার সবখানেই। হীরার মতো দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আলো পড়ায় জ্বল জ্বল করে উঠেছে আরো শতগুণ।

গুহার দেয়ালে অনেক গর্ত। ওগুলোর ওপাশে আরো গুহা আছে নিশ্চয়। কিন্তু এখন আর দেখার সময় নেই। বাকল পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আলো ছাড়া অন্ধকার গুহায় ঢোকার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া কোথায় কোন্ বিপদ ঘাপটি মেরে আছে, কে জানে!

আলো নিভে গেল।

আবার ফিরে এলাম আমরা বাইরের পৃথিবীতে, সূর্যের আলোয়।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে পিটারকিন। আমাদের দেখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে।

ষোলো

গুহাটার নাম দিয়েছি আমরা, হীরক-গুহা। কাটিয়ে এসেছি বড়-জোর আধ ঘণ্টা। কিন্তু ফিরে এসে বাইরের আলো বাতাস ওই গুহার চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হলো।

কাপড় পরে নিলাম। বাড়ি ফিরে যাবো। ভাষায় বর্ণনা করে যতোখানি দেখানো সম্ভব, পিটারকিনকে দেখালাম হীরক-গুহার ছবি। সাঁতার জানে না বলে এই প্রথম অনুশোচনা বেশি হলো তার।

বাড়ি রওনা হলাম। খানিকটা এগোতেই কানে এলো শুয়োরের ডাক।

'শুনছো!' নিচু গলায় বললো জ্যাক। 'পিটারকিন, তোমার বন্ধুরা এসেছে দেখা করতে। চলো তো, দেখি। সাবধানে এগোবে, পায়ের শব্দ যেন না হয়।'

পা টিপে টিপে এসে ঢুকলাম বনে।

আরো জোরালো হলো শুয়োরের চেঁচামেচি। কাছেই কোথাও আছে কুৎসিত জীবগুলো।

'পিটারকিন?' চাপা গলায় ডাকলো জ্যাক।

'কি ?'

'এখানে দাঁড়াও। র‍্যালফ্, একটু সরে দাঁড়াও। তুমিও থাকো এখানেই। ঘুরে গিয়ে এদিকেই তাড়িয়ে আনবো ব্যাটাদের। মোটাসোটা বাচ্চা দেখে মারার চেষ্টা করবে।' বলেই পা বাড়ালো সে। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

'আসছে না কেন এখনো!' জিভ বুলিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজালো পিটারকিন।

'হেই! হেই!' কাছেই বনের ভেতরে শোনা গেল জ্যাকের গলা।

'ওই যে, আসছে!' বল্লম বাগিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালো পিটারকিন। শুয়োর বেরোলেই গেঁথে ফেলবে।

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে পিটারকিন। বেরোতে দেরি করছে কেন শুয়োরগুলো! সামনে ঝুঁকলো সে। ঝোপের ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো। নেই। আবার সোজা হলো। সতর্কতা কমে গেছে।

কেবল সোজা হয়েছে পিটারকিন, ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের আরেকটা ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো ছুটো শুয়োর, একটা বাড়ি, একটা বাচ্চা। পাঁই করে ঘুরতে গিয়েই লতায় বেধে গেল পা। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল সে কাত হয়ে। সাঁ করে তার কানের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বাচ্চাটা। সোজা হয়ে বসার আগেই পায়ের ওপর এসে পড়লো বাড়িটা, তার নাকের গুঁতোয় চিত হয়ে উল্টে পড়লো পিটারকিন। ওর পেট ডিঙিয়ে

চলে গেল জানোয়ারটা।

ওদের দিকে নজর দেবার সময় আমার নেই। কাছে দিয়ে চলে গেল বাচ্চাটা। গুলতি তাক করলাম। প্রথম দিনের মতো ফস কালো না আজ। শুয়োরের কানের কাছে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানলো পাথর। বেহুঁশ হয়ে গেল ওটা।

'দারুণ, রালফ!' চেঁচিয়ে উঠলো পিটারকিন। উঠে পড়লো হাঁচড়ে-পাঁচড়ে। বল্লম বাগিয়ে ধরে ছুটলো উপত্যকার দিকে। ওদিকেই শোনা যাচ্ছে এখন শুয়োরের চেঁচামেচি, ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

পড়ে থাকা বাচ্চাটার মাথায় মুগুর দিয়ে জোরে এক বাড়ি লাগালাম। গুঁড়িয়ে গেল মাথা। তারপর ছুটলাম পিটারকিনের পিছু পিছু।

উপত্যকার একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটা মাদী শুয়োর, পেছনে আসছে কয়েকটা বাচ্চা।

'লাগাও, পিটারকিন!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললাম। 'বড় বাচ্চাটাকে গেঁথে ফেলো!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো পিটারকিন। তার দিকেই এগোচ্ছে শুয়োরগুলো। চট করে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লো সে। তাকে দেখতে পেলো না বড়ো শুয়োরটা, এগিয়ে এলো। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো পিটারকিন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুটে গিয়ে বল্লম চালালো। গায়ের জোরে মেরেছে সে। মাদী শুয়োরের এপাশ দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বল্লমের ফলা।

ছুটে কাছে চলে এলাম। 'এটা কি করলে!'

'কেন, কি করেছি?' আমার দিকে ফিরলো পিটারকিন।

'ধাড়িটাকে মারলে কেন?'

'আরে, পিটারকিন!' পেছন থেকে বলে উঠলো জ্যাক। 'ওই বুড়িটাকে মারলে কেন? চিবুতে তো দাঁত ভেঙে যাবে!'

'কে যাচ্ছে চিবুতে?'

'তাহলে মারলে কেন খামোকা?'

'জুতো।'

'জুতো! শুয়োরের সঙ্গে জুতোর কি সম্পর্ক? তোমার জুতো তো তোমার পায়েই রয়েছে!'

'রয়েছে, তবে ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। আর বেশি-দিন পায়ে দিতে পারবো না। তার আগেই বানিয়ে নিতে চাই। বাচ্চা তো একটা মেরেছেই রালফ, মাংস হয়ে গেল। চামড়ার জন্যে বুড়িটাকে মারলাম আমি। খারাপ করেছি?'

'না না,' জোরে মাথা নাড়লো জ্যাক, 'ঠিকই করেছো।'

মাংস শক্ত, তাই বলে ফেলে দেবো না বড়ো শুয়োরটাকে। ভালো করে আগুনে সেঁকে নিলেই নরম হয়ে যাবে। কিন্তু এতো মাংস নিই কি করে? শেষে, মোটা দেখে একটা ডাল কেটে আনলো জ্যাক। শুয়োরের সামনের দু'পা এক সঙ্গে করে বাঁধলো, পেছনের পা-ও বাঁধলো একই রকম করে। দুই জোড়া পায়ের মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো ডালটা। ডালের দু'মাথা আমাদের দুজনের কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো এখন

শুয়োরটাকে। বাচ্চা শুয়োরটাকে একাই বয়ে নিতে পারবে পিটারকিন।

খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলাম। সারাটা পথই বকর বকর করলো পিটারকিন। হাসিয়ে মারলো আমাদের।

ভুরিভোজের পর ঘুমোতে গেলাম। মরার মতো ঘুমোলাম সারাটা রাত।

সতেরো

পরদিন থেকে আবার নৌকা তৈরির কাজে মন দিলাম।

খুব কঠিন এবং বিরক্তিকর কাজ। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি থাকলে এতোখানি খারাপ লাগতো না। একটা কুড়াল আর লোহার পাতে বানানো একটা ছুরি দিয়ে নৌকা তৈরি কতোখানি কঠিন আর ধৈর্যের ব্যাপার, সামান্য কল্পনা করলেই যে কেউ বুঝতে পারবে। তবু কাজ চালিয়ে গেলাম আমরা।

কুড়াল দিয়ে কেটে কেটে তক্তা বানালো জ্যাক। তামার পেন্সিল দিয়ে ছিদ্র করলো জোড়াগুলোতে, কাঠের সরু গজাল বানিয়ে ছিদ্রে ঢুকিয়ে আটকে দিলো একটার সঙ্গে আরেকটা তক্তা। ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগলো নৌকার অবয়ব। এখনো অনেক কাজ বাকি।

কাঠ কেটে তক্তা করার কাজে আমি সাহায্য করি জ্যাককে। নারকেলের গামছা জোগাড় করে, সমান করে কেটে ওগুলো জোড়া দেবার ভার পিটারকিনের ওপর। পাল সেলাইয়ের সুচ আছে একটা। নারকেলের গামছা থেকে লম্বা আঁশ বের করে নিয়ে সুতো বানালো সে। চললো পাল তৈরি।

এক বিকেলে, আমি আর পিটারকিন রান্নার জোগাড় করছি, এই সময় সৈকত থেকে ফিরে এলো জ্যাক। ধপ করে বালির ওপর বসে পড়ে বললো, 'নৌকা বানানো শেষ! এবার দু'জোড়া দাঁড় বানিয়ে নিলেই সাগরে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

খবরটা শুনে খুব খুশি হলাম। যাক বাবা, বাঁচা গেল! কি খাটুনিই না গেছে কিছুদিন ধরে!

তক্তার জোড়ার ফাঁকে ফাঁকে নারকেলের গাছা ভরা—যাতে পানি না উঠতে পারে, দাঁড় বানানো, পাল সেলাই, এমনি সব টুকটাক কাজ সারতেই পেরিয়ে গেল আরো এক হপ্তা।

আরেক বিকেল। রান্না করছি। জ্যাক এসে খবর জানালো, নৌকার আর কোনো কাজ বাকি নেই।

'জ্যাক,' খুশিতে নাচতে লাগলো পিটারকিন, 'তুমি একটা দেবতা! আগামীকাল সকালেই সাগরে বেরোবো আমরা···।'

'বেশি খুশি হয়ো না, কাঁদতে হতে পারে,' পিটারকিনকে থামিয়ে দিয়ে বললো জ্যাক। 'দেখি দাও, এক টুকরো মাংস দাও।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়!' উচ্ছ্বাস বিন্দুমাত্র কমলো না পিটারকিনের। কুড়ালটা তুলে নিয়ে বললো, 'কোন্ জায়গার চাও?'

'রানের। লেজেরও খানিকটা দিতে পারো।'

'দিচ্ছি,' শুয়োরের রানের বড় এক টুকরো মাংস কাটলো পিটারকিন। ছুরি দিয়ে লেজ কাটলো। বাড়িয়ে দিলো জ্যাকের দিকে। 'নাও।'

'পুরো লেজটাই দিয়ে দিলে? তোমাদের জন্যে রাখলে না?'

'ওটা তোমার প্রাপ্য। খেয়ে ফেলো।'

চমৎকার ঝলসানো হয়েছে মাংস। বাতাসে কাবাবের সুগন্ধ।

'কালই সাগরে বেরোচ্ছি আমরা, না জ্যাক?' বললো পিটারকিন।

'যাচ্ছি, তবে লাগুনের বাইরে নয়। পানিতে ভাসিয়ে দেখতে হবে আগে। নৌকায় কোনোরকম গোলমাল আছে কিনা না জেনে গেলা সাগরে বেরোনো উচিত হবে না।'

'যদি কোনো গোলমাল না থাকে?'

'বেরিয়ে পড়বো একদিন,' মাংস চিবোতে চিবোতে জবাব দিলো জ্যাক। 'আশপাশের সবকটা দ্বীপ ঘুরে দেখে আসবো। আগে যাবো পেঙ্গুইন দ্বীপে।'

'বা মজা হবে না!' আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠলো পিটারকিন।

আলাপ আলোচনার মাঝেই খাওয়া শেষ হলো। অনেক রাতে শুতে গেলাম আমরা সেদিন।

আঠারো

অপূর্ব সুন্দর এক সকাল। ল্যাগুনের পানি শান্ত। এক বিন্দু বাতাস নেই, ঢেউ নেই। গাঢ় নীল আকাশের কোথাও মেঘ নেই এক রত্তি। আয়নার মত সমতল পানি, চকচকে। নৌকা ভাসালাম আমরা।

আকাশের ছায়া পড়েছে পানিতে। ল্যাগুনের পানিও গাঢ় নীল দেখাচ্ছে। নিচে, রঙিন শেওলা আর প্রবাল উজ্জ্বল আলোয় গহনার মতো চমকাচ্ছে।

দাঁড় বেয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম আমরা কিছুক্ষণ। একঘেয়ে লাগতে শুরু করলো শিগগিরই।

'এভাবে আর ভাল্লাগছে না,' এক সময় বলেই ফেললো পিটারকিন। 'চলো দেয়ালের ওদিকে চলে যাই।'

'বরং ল্যাগুনের ভেতরের দ্বীপগুলো ঘুরে এলেই পারি,' আমি প্রস্তাব রাখলাম।

'তুজায়গায়ই যাবো,' বললো জ্যাক 'জোরসে টানো দাঁড়!'

দু'জোড়া দাঁড় বানিয়েছি আমরা। একজোড়া দিয়ে বাইবো, একটা হাল, আরেকটা বাড়তি। প্রথমে হাল ধরলো জ্যাক। তারপর

আমি, তারপর পিটারকিন। এভাবে পালা করে হাল ধরে জিরিয়েও নেয়া যাচ্ছে।

প্রথমে, ছোটো একটা দ্বীপে নামলাম আমরা। আকর্ষণীয় তেমন কিছুই নেই এটাতে। তারপর নামলাম সবচেয়ে বড়টাতে। এতেও তেমন কিছু নেই। বেশ কিছু নারকেল গাছ আছে। তলায় পড়ে আছে অসংখ্য শুকনো নারকেল। কয়েকটা কুড়িয়ে নিয়ে নাস্তা সারলাম আমরা। তারপর আবার এসে উঠলাম নৌকায়। প্রবাল প্রাচীরে যাবো এবার।

বিরাট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে, কান-ফাটানো শব্দে ভাঙছে। দৃশ্যটা নতুনই মনে হলো আমাদের কাছে। ল্যাগুনের শান্ত পানি দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, ওই ঢেউ দেখে দোলা লাগলো আবার রক্তে। এতোদিন প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, যে আমরা নাবিক। অন্য দুজনের কথা জানি না, আমি দূর সাগরের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম আবার জেগে জেগেই। ভুলে গেলাম, আমরা এক প্রবাল দ্বীপে নির্বাসিত। ভুলে গেলাম আমাদের কুঁড়ে, জলজ বাগান, অ্যাকোয়ারিয়ামের কথা। চোখের সামনে ভাসছে খালি নীল-শাদা ঢেউ আর ঢেউ।

চমক ভাঙলো জ্যাকের কথায়: 'এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলো, অন্য দ্বীপগুলো দেখি।'

ল্যাগুনের ভেতরের প্রায় সব কটা দ্বীপেই নামলাম আমরা।

আকর্ষণীয় তেমন কিছু নেই কোনোটাতেই। বিকেলে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

খেয়েদেয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম বালিতে, কুঁড়ের ছায়ায়।

'বেশ ভালোই হয়েছে নৌকা,' বললো জ্যাক। 'এবার মাস্তুল বসিয়ে পাল টানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

পরদিন থেকে আবার কাজে লেগে গেলাম। ঘাটে বাঁধা নৌকাটা টেনে তুলে আনলাম সৈকতের বালুতে। উল্টে নিয়েই থমকে গেলাম। এ-কি! জায়গায় জায়গায় ছালচামড়া উঠে গেছে, কোথাও গভীর হয়ে চিরে গেছে, কোথাও কেটে ভেঙ্গে পড়ে গেছে কাঠের চিলতে।

'না-রে ভাই, এতে হবে না!' জোরে শ্বাস ফেললো জ্যাক। 'ভাঙা প্রবাল পাথরের কাজ। এ অবস্থায় এটা নিয়ে সাগরে বেরোনো যাবে না। ঢেউয়ের বাড়িতে তলাই খসে যাবে হয়তো!'

'তাহলে?' ভাবনায় পড়ে গেলাম। উপায় একটা বের করতেই হবে, নইলে নৌকাবিহারের এখানেই ইতি। 'পেঙ্গুইন দ্বীপে কি যেতে পারবো না!'

'ওসব বাজে পাখি দেখি না আমরা,' মাথা নাড়লো পিটারকিন। 'প্রবাল দ্বীপেই দেখার মত অনেক কিছু আছে।'

'পিটারকিন, কথা কম বলো,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো জ্যাক। 'এসো কাজ করতে হবে। রালফ, তুমিও এসো।'

আবার গাছ কাটলাম আমরা, তক্তা করলাম। নৌকার তলায় আর একটা তলা লাগানোর ব্যবস্থা হলো। প্রবালের ঘষা বাইরেরটার ওপর দিয়েই যাবে, ভেতরেরটার কোনো ক্ষতি হবে না।

কঠোর পরিশ্রমের পর শেষ হলো কাজ। এবার মাস্তুল বসানোর পালা। ইতিমধ্যে পিটারকিন চুপ করে বসে থাকেনি। আমাকে আর জ্যাককে সাহায্য করার ফাঁকে ফাঁকে আরেকটা পাল তৈরি করে ফেলছে সে। দুটো পাল একটার ওপর আরেকটা রেখে সেলাই করে দিয়েছে। ফলে বেশ মজবুত হয়েছে জিনিসটা, জোড় বাতাসের চাপও সামলাতে পারবে। নারকেলের ছোবড়া পাকিয়ে প্রচুর দড়িও বানিয়ে ফেলেছে সে।

এইবার আবার পানিতে ভাসালো নৌকা। বাইরের দ্বীপে যাবো। ল্যাগুনের পানিতে বড় মাছ ধরতে যেতে পারবো যে কোনো সময়। মাছ ধরার জন্যে সরু শক্ত দড়ি পাকিয়ে নিয়েছে পিটারকিন। আঙুলের তামার আঙটিটা দিয়ে চমৎকার দুটো বড়শিও বানিয়ে ফেলেছে জ্যাক। আগের মতো দড়িতে ঝিনুক বেঁধে আর পানিতে ফেলতে হবে না। বড়শিতে টোপ গেঁথেই ফেলা যাবে। পুরোপুরি মাছের ইচ্ছের ওপরও আর নির্ভর করতে হবে না। টোপ মুখে নিলেই গেঁথে ফেলা যাবে।

নৌকা ভাসালাম পানিতে। সব রকম পরীক্ষা করে দেখলাম। না, আর কোনো খুঁত নেই। মাস্তুল বেশ শক্ত হয়েছে, পালও কাজ করছে ভালো। বাতাসের চাপ সইতে পারছে ঠিকমতোই। তবে, খোলা সাগরে জোরালো হাওয়ার ধাক্কা সইতে পারবে তো?

উনিশ

দিন কয়েক পরে একদিন। হীরক-গুহার ওপরের পাথরে বসে আছি। আলাপ-আলোচনা করছি পেঙ্গুইন দ্বীপে যাওয়া নিয়ে।

'তোমরা তাহলে যাচ্ছোই পেঙ্গুইন দ্বীপে?' মাতব্বরী চালে বলে উঠলো পিটারকিন। 'পাখিগুলো দেখার লোভ ছাড়তে পারছো না কিছুতেই?'

'না,' জবাব দিলাম, 'ছাড়তে পারছি না। আমি যাবোই।'

'আমার মনে হয়,' বললো জ্যাক, 'পিটারকিনের যাবার ইচ্ছে নেই। ও প্রবাল দ্বীপেই থাক। বাড়ি পাহারা দিক।'

'বাড়ি পাহারা দেবো!' চেঁচিয়ে উঠলো পিটারকিন। 'আর কাজ নেই খেয়ে। তোমরা গেলে আমাকেও যেতেই হবে। নইলে যা বোকাচণ্ডী আর ভুলো মন একেকজনের, দেখবে কে তোমাদের?'

'ঠিক, ঠিক বলেছে,' আমার দিকে চেয়ে বললো জ্যাক, 'ওকে নিতেই হচ্ছে। তাহলে আর নৌকা ঠিক রাখার জন্যে পাথর নিতে হবে না। চিত করে পাটাতনে ফেলে রাখলেই হবে। শুয়োর খেয়ে খেয়ে কি মোটা হয়েছে দেখেছো? ঠিক একেবারে ওই জীব-

গুলোর মতোই,' পিটারকিনের দিকে ফিরে বললো, 'তা খোকা-বাবু, যাবেনই যখন, কয়েকটা স্বজাতি মেরে নিয়ে আসুন না। খাবার নিয়ে যেতে হবে না সঙ্গে?'

হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসিটা সংক্রমিত হলো পিটার-কিন আর জ্যাকের মাঝেও।

খাবার জোগাড়ে মন দিলাম। অন্তত দুটো রাত কাটানোর ইচ্ছে পেঙ্গুইন দ্বীপে। ওখানে খাবার আছে কিনা কে জানে। ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।

বল্লমটা কাঁধে ফেলে বনে গিয়ে ঢুকলো পিটারকিন, একা। শুয়োর মারার ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। ফিরে এলো তিনটে মোটা-তাজা বাচ্চা শুয়োর মেরে নিয়ে।

গুলতি ছুঁড়ে আমি কয়েকটা হাঁস মেরে আনলাম। নারকেল কুড়িয়ে আনলাম কিছু। পিটারকিনকে দিয়ে ডাব পাড়িয়ে নিলাম। খাবার জোগাড় হয়ে গেল। এবার পেঙ্গুইন দ্বীপে রওনা দেওয়া যায়।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়লাম ঘুম থেকে। নৌকায় নিয়ে গিয়ে জমা করলাম সব খাবার।

'একটু বেশি হয়ে গেল না?' খাবারের স্তূপের দিকে চেয়ে বললাম।

'কম পড়ার চেয়ে বেশি হওয়া ভালো,' বললো পিটারকিন।

সূর্য উঠলো। আকাশ পরিষ্কার। বাতাস নেই। বেরিয়ে পড়া যায়।

ছুটো ছোটো ছোটো দ্বীপের পাশ কাটিয়ে চলে এলাম জাহাজ-ডুবি ফাটলের কাছে। বেরিয়ে এসে পড়লাম খোলা সাগরে। বাতাস নেই, তবু কি বড় বড় ঢেউ! দোল খেতে শুরু করলো নৌকা। শক্ত হাতে হাল ধরলো জ্যাক। 'বাতাস থাকলে ভালো হতো!'

'হ্যাঁ!' দাঁড়টা ছুই উরুর ওপর রেখে কপালের ঘাম মুছলো পিটারকিন। মাথার ওপরে সী-গালের ঝাঁক দেখিয়ে বললো, 'শ'-ছুয়েক ওই পাখি ধরতে পারলে, আরো ভালো হতো! নৌকার সঙ্গে বেঁধে দিলে উড়িয়ে নিয়ে যেতো। যেখানে খুশি উড়ে চলে যেতে পারতাম!'

'কিংবা হাঙরের লেজ ফুটো করে দড়ি ঢুকিয়ে নৌকার সঙ্গে বেঁধে দিতে পারলে···সেটাও ভালো হতো,' বললো জ্যাক। 'দাঁড় আর বাইতে হতো না। হাঙরই টেনে নিয়ে যেতো। চাইকি, পাতালের রাজপুরীতে ডোজ খেতেও যেতে পারতে।' চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ। 'এই যে, ঈশ্বর আমার ডাক শুনেছে! এসে গেছে বাতাস! পিটারকিন, পালের দড়ি টেনে বাঁধো!'

এলোমেলো দমকা বাতাস। পালে লেগে গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিলো নৌকাটাকে। তারপরই পরিবর্তন ঘটলো বাতাসের। ঝিরঝির করে সমান তালে বইতে লাগলো। ফুলে উঠলো পাল। তরতর করে ছুটে চললো নৌকা।

পেঙ্গুইন দ্বীপের মাইল খানেক দূরে আছি আমরা, এই সময় যেমন হঠাৎ করে এসেছিলো, তেমনি হঠাৎ করেই পড়ে গেল

আবার বাতাস। অসুবিধে নেই। ওটুকু পথ দাঁড় বেয়েই চলে যেতে পারবো।

পৌঁছে গেলাম দ্বীপের কাছাকাছি।

'ওই যে যায়, সৈনিকেরা!' 'আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলো পিটারকিন।

চেয়ে দেখলাম, সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছে কয়েকটা পেঙ্গুইন। পানিতে নামবে বোধহয়।

'কি সুন্দর দেখছো!' আবার বললো পিটারকিন। 'পেটের পালক কি শাদা! মসৃণ! দেখছো, কেমন চকচক করছে পিঠের কালচে-নীল পালকগুলো?...জ্যাক, পেঙ্গুইন কি মাংস অপছন্দ করে?'

'জানি না। কথা বোলো না, দাঁড় বাও চুপচাপ।'

আরো কাছে পৌঁছে গেলাম দ্বীপের। অদ্ভুত পাখিগুলোর আজব চেহারা আর চাল চলন দেখে হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। দাঁড় বাওয়া থামিয়ে চেয়ে আছি ওদের দিকে। ওরাও চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

বেঁটে পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। কালো নেশ বড় মাথা। লম্বা, ধারালো ঠোঁট। বুকের পালক ধবধবে শাদা, পিঠ নীলচে-কালো। দেহের তুলনায় ক্ষুদে ডানা। উড়তে পারে না। ওই ডানা তাহলে কি কাজে লাগে! পরে জেনেছি, পানির তলায় সাঁতার কাটার সময় মাছের পাখনার মতো ব্যবহার করে ওরা। সারা দ্বীপ জুড়ে হাজারে হাজারে পেঙ্গুইন। কর্কশ গলায়

একনাগাড়ে কলরব করে চলেছে।

এক জায়গায় কয়েকটা পাখির মাঝে কয়েকটা চারপেয়ে জন্তু পড়ে থাকতে দেখলাম। ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে। আকারে ছোটো।

'যাও,' ঝপাং করে দাঁড় পানিতে ফেললো পিটারকিন। 'কি জানোয়ার ওগুলো দেখতে হচ্ছে। এতো গোলমালের মাঝে বাস করার সাধ হলো, এ কোন ধরনের জীবরে বাবা!'

আরো এগিয়ে নিয়ে গেলাম নৌকা। আশ্চর্য! চারপেয়ে জন্তুগুলোও পেঙ্গুইন। ডানা দুটোকে পায়ের মতো ব্যবহার করছে।

পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা মা পেঙ্গুইন, নিচে দাঁড়িয়ে তার বাচ্চা। মুখোমুখি। হঠাৎ আকাশের দিকে ঠোঁট তুলে দিয়ে বিচ্ছিরি শব্দ করতে লাগলো মা। পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ভোঁতা আওয়াজ।

'লেগেছে!' বলে উঠলো পিটারকিন। 'পাখিটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে!'

পর মুহূর্তেই মাথা নামালো মা, ঠোঁট ফাঁক করলো যতখানি সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা ঠোঁট ঢুকিয়ে দিলো মায়ের গলার ভেতর, কি যেন বের করে নিলো, দেখতে পেলাম না। গিলে ফেললো। আবার আকাশের দিকে ঠোঁট তুললো মা। শব্দ করলো, আবার নামালো, ঠোঁট ফাঁক করলো। বাচ্চাটা তার গলায় ঠোঁট ঢুকিয়ে দিয়ে খাবার বের করে নিয়ে খেলো।

'আরে, দেখো দেখো, বাচ্চাকে ধরে পেটাচ্ছে মা!' আরেক

দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পিটারকিন। 'কি হারামী মা-রে, বাবা!'

একটা বেশ উঁচু পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে আরেক মা-পেঙ্গুইন। তাকে বার বার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে বাচ্চাটা, কিন্তু পারছে না। ডানা দিয়ে আগলে দাঁড়াচ্ছে মা। মাঝেমধ্যে এক-আধটা চাপড়ও লাগাচ্ছে। শেষে ধাক্কা দিয়ে বাচ্চাটাকে ওপর থেকে পানিতে ফেলে দিলো। ডুবে গিয়েই ভেসে উঠলো বাচ্চাটা। ক্ষুদে ডানা নেড়ে সাঁতরানোর চেষ্টা করতে লাগলো। ভেসেই আছে, ডুবে যাচ্ছে না। বুঝতে পারলাম, বাচ্চাকে সাঁতার শেখাচ্ছে মা।

'টানো, দাঁড় টানো,' বললো জ্যাক। 'ডাঙায় উঠবো।'

সরু একটা প্রণালীতে নৌকা ঢোকালাম আমরা। তীরে ভিড়িয়ে একটা পাথরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। মুগুর আর বল্লম নিয়ে নামলাম ডাঙায়। কাছ থেকে দেখবো পাখিগুলোকে।

পেঙ্গুইনের কলোনিতে এসে ঢুকলাম। ভয় পাচ্ছে, এমন কোনো লক্ষণই দেখালো না। আমাদের যেন গ্রাহ্যই করছে না পাখিগুলো।

বিরাট এক বুড়ো পেঙ্গুইন হঠাৎ লাফিয়ে নেমে এলো একটা পাথরের ওপর থেকে। ভারিক্কি চালে শরীর দোলাতে দোলাতে এগোলো সাগরের দিকে। কি ভেবে ছুটে গেল পিটারকিন। পাখিটার পথরোধ করে দাঁড়ালো। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না পেঙ্গুইন, নিজের পথ থেকে সরলো না এক চুল। বল্লম তুলে পাখিটাকে ভয়

দেখানোর চেষ্টা করলো সে। পাত্তাই দিলো না ওটা। কাছে এসে শরীরের একপাশ দিয়ে ধাক্কা মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিলো তাকে। ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে।

আজব পাখিগুলোকে দেখে দেখে তিনটে ঘন্টা পার করে দিলাম আমরা।

'আমার তো মনে হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে অদ্ভুত পাখি এই পেঙ্গুইন!' মন্তব্য করলো পিটারকিন।

'কি জানি!' বললো জ্যাক। 'হতেও পারে!'

বিশ

বিকেলের দিকে পেঙ্গুইন দ্বীপ ছাড়লাম আমরা। যে হারে গোলমাল করে পাখিগুলো, এখানে রাত কাটানোর আশা বৃথা। তাই কাছেরই আরেকটা ছোটো দ্বীপের দিকে রওনা হলাম।

কপাল খারাপই বলতে হবে। নইলে ভালো আবহাওয়া দেখে নৌকা ছেড়েছি, মাঝপথে যেতে না যেতেই হঠাৎ ঝড় উঠবে কেন? তাড়াতাড়ি পালের দড়ি খুলে দিয়ে দাঁড় ফেললাম পানিতে। কিন্তু বাওয়া গেল না। বড় বড় ঢেউ। বাদামের খোসার মতো দুলতে লাগলো নৌকা। হুড়মুড় করে পানি ঢুকছে ভেতরে। এটা বন্ধ করতে না পারলে ডুবেই যাবে নৌকা।

'সামাল্য টেনে ধরো পালের দড়ি!' নির্দেশ দিলো জ্যাক। 'পেঙ্গুইন দ্বীপেই ফিরে যেতে হবে।'

'রাত কাটানোর সঙ্গীসাথী বেশ ভালোই মিলবে!' ফোড়ন কাটলো পিটারকিন।

পালের দড়িতে টান দিতে না দিতেই বাতাসের গতির পরিবর্তন ঘটলো। এক পাশ থেকে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারলো নৌকাটাকে। প্রায় উল্টেই ফেলেছিলো, তাড়াতাড়ি সে পাশে

সরে গিয়ে কোনোমতে ভারসাম্য ঠিক রাখলো জ্যাক।

'সাবধান!' বাতাসের তীক্ষ্ণ শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল জ্যাকের গলা। 'দড়ি ছাড়বে না! দুজনেই ধরো শক্ত করে!'

জ্যাকের কথা শেষ হওয়ার আগেই আবার আঘাত হানলো বাতাস। ঝটকা দিয়ে ছিঁড়ে ফেললো পালের দড়ি। চরকির মতো পাক খেতে লাগলো নৌকা। ইতিমধ্যেই অর্ধেক ভরে গেছে পানিতে।

দু'হাতে পানি সেচে ফেলতে লাগলাম আমি আর পিটারকিন। গতিপথ থেকে অনেক সরে গেল নৌকা। কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। পেঙ্গুইন দ্বীপ চোখে পড়ছে না আর এখন। কোন্‌দিকে যাবো! যেদিকে তাকাই, শুধু অথৈ পানি। মাঝ সাগরে নিয়ে এসেছে আমাদেরকে ঝড়। তিনজনেই নাবিক। কতোখানি বিপদে পড়েছি, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

চারপাশে নাচানাচি করছে বড় বড় ঢেউ। কালো পাহাড় যেন একেকটা, মাথায় শাদা ফেনা। এর মাঝে নৌকাটা যে এখনো টিকে আছে, এটাই আশ্চর্য। তবে আর বেশিক্ষণ টিকবে বলে মনে হয় না। পানি সেচে কুলাতে পারছি না। মাস্তুলের মাথায় বিশাল এক পতাকার মতো পত পত করছে পালটা। ছিঁড়ে উড়ে চলে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। না, আর কোনো আশা নেই আমাদের।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক। আঙুল তুলে দেখালো। সামনেই একটা দ্বীপ। না না, টিলা। সাগরের নিচ থেকে গজিয়ে

উঠেছে গ্র্যানাইটের বিশাল ওই টিলাটা। মাটির নাম গন্ধও নেই। গাছপালা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তবু ডাঙা। আশা জাগলো মনে।

জ্যাকের নির্দেশে প্রাণপণে দাঁড় বাইতে লাগলাম আমি আর পিটারকিন। যে করেই হোক, পৌঁছুতে হবে ওই টিলায়।

কাছাকাছি এসে আবার হতাশ হয়ে পড়লাম। টিলার গায়ে নৌকা ভেড়ানো যাবে না। প্রচণ্ড জোরে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, কিনারটা ভরে গেছে শাদা ফেনায়। এক আছাড়েই চুরমার করে দেবে নৌকা। দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

'থামলে কেন!' চেঁচিয়ে উঠলো জ্যাক। 'টিলার ওপাশে নিয়ে যাবো নৌকা!'

এগোচ্ছে না নৌকা। দাঁড় বেয়ে কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না ঢেউয়ের সঙ্গে।

'পিটারকিন!' আবার চেঁচিয়ে বললো জ্যাক। 'মাস্তুল বেয়ে উঠে দেখো পালটা ধরতে পারো কিনা! হবে না পাল ছাড়া!'

দাঁড়টা নৌকার পাটাতনে ফেলে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো পিটারকিন। মাস্তুল আঁকড়ে ধরে বেয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করলো। পিচ্ছিল হয়ে আছে ভিজে, ধরে রাখাই মুশকিল। তবু, পিটারকিন বলেই হয়তো, শেষ পর্যন্ত পালের কাছাকাছি উঠে যেতে পারলো। একবার কাত হয়ে গিয়েও আবার সোজা হলো নৌকা। এই সুযোগে পালের নিচের দিকটা হাতের কাছে চলে এলো। থাবা মেরে ধরে ফেললো পিটারকিন। দড়ির বেশির

ভাগই এখনো পালের কোণায় বাঁধা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে এসে মাস্তুল আঁকড়ে ধরলাম এক হাতে, আরেক হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম দড়িটা। পিটারকিন ছেড়ে দিলো পাল। হুড়াং করে নেমে চলে এলো পাটাতনে। দুজনে মিলে চেপে ধরলাম দড়ি। ফুলে উঠলো পাল। প্রচণ্ড টান পড়লো দড়িতে। ছাড়লাম না। আবার ছিঁড়ে যায়, যাক।

ছিঁড়লো না দড়ি। উড়ে চললো যেন নৌকাটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে। চোখের পলকে চলে এলাম টিলার কাছে। জ্যাক কতোখানি পাকা নাবিক, এই প্রথম জানলাম। টিলার গায়ে বাড়ি লাগার আগেই নৌকার নাক ঘুরিয়ে দিলো। পাশ কাটিয়ে নিয়ে চলে এলো আরেক পাশে।

কাস্তের মতো বাঁকা টিলা, পিঠটা ওপাশে, ওদিকেই আঘাত হানছে বাতাস আর ঢেউ। এদিকটা অনেক শান্ত। কাস্তের পেটে ঢুকে যেতে লাগলো নৌকা।

'দড়ি ছেড়ে দাও!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলো জ্যাক।

ছেড়ে দিলাম।

কাস্তের পেটের ঠিক মাঝ বরাবর সরু একটা প্রণালী কয়েক গজ ভেতরে ঢুকে গেছে। একবার ঢুকছে একবার বেরোচ্ছে পানি ওপথে, পাথরের গায়ে বাড়ি মারছে ভোঁতা শব্দ তুলে, ফেনায় ফেনায় ভরে গেছে। সোজা ওখান দিয়ে নৌকা ঢুকিয়ে দিলো জ্যাক। 'রালফ, নামো, নেমে পড়ো! নৌকার দড়ি বেঁধে ফেলো!'

ভীষণ দুলছে নৌকা। এরই মাঝে কোনোমতে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম পাথরের ওপর। পা পিছলে পড়ে যেতে যেতেও কোনোমতে সামলে নিলাম। পানির টানে সড়সড় করে নিচে নেমে যেতে লাগলো নৌকা। দড়িটা টেনে বের করে নিয়ে যেতে লাগলো হাতের মুঠো থেকে। চামড়া ছিলে গিয়ে জ্বালা করে উঠলো। দু'হাতে কোনোমতো ওটাকে টেনে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পানি প্রণালীতে ঢুকতেই আবার খানিকটা এগিয়ে এলো নৌকা। পিটারকিনকেও নামার নির্দেশ দিলো জ্যাক।

দুজনে মিলে কোনোমতে একটা পাথরের গায়ে পেঁচিয়ে বাঁধলাম নৌকার দড়ি। এইবার নামলো জ্যাক।

'আহ্, বাঁচলাম!' হাঁপ ছেড়ে বললাম।

'বাঁচলাম কি! এখন তো সবে শুরু! ঝড় এখনো ভালোমতো আসেইনি!' বললো জ্যাক। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। এক জায়গায় খাড়া উঠে গেছে পাথরের দেয়াল। তার মাঝে একটা গর্ত।

'নিশ্চয় গুহা!' বলে উঠলো জ্যাক। 'হাত লাগাও, নৌকাটাকে তুলে রেখে ওখানে গিয়ে ঢুকি।'

তিনজনে মিলে টেনে পাথুরে একটুখানি সমতল জায়গায় নৌকাটাকে তুলে আনলাম। দুদিক থেকে দুটো বড় পাথরের সঙ্গে বাঁধলাম নৌকার দড়ি। তারপর খাবারের বোঝা তুলে নিয়ে ঢুকে পড়লাম গর্তে।

ছোটো একটা খোঁড়ল। তারই ভেতরে বসলাম গাদাগাদি করে। এই সময় নামলো ঝমাঝম বৃষ্টি।

তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত একটা বাঁশির মতো আওয়াজ কানে আসছে সেই তখন থেকেই। থেমে গেল ওটা হঠাৎ। এক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপরই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। ভয়ংকর সেই ঝড়ের বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। বিশাল ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে টিলার ওপাশে, আওয়াজ শুনছি। একবার বাড়ছে একবার কমছে প্রণালীর পানি। কখনো উঠে আসছে সমতল জায়গাটার ওপর, ভেসে উঠছে নৌকা। ওটাকে ভাসিয়ে না নিয়ে যায়! শংকিত হয়ে উঠলাম।

'আমরা বললেই তো আর ঝড় থামবে না,' বললো পিটার-কিন। 'এসো, খেয়ে নিই। পেট ঠাণ্ডা করি আগে, তারপর মরলে মরলাম।'

ঠিক। রাতের আঁধার নামতে আর বেশি বাকি নেই। খেতে বসে গেলাম আমরা।

পেট ঠাণ্ডা হতেই ভয় অনেকখানি কেটে গেল। খোঁড়লের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে জাঁকিয়ে বসলাম আমরা।

রাত নামতেই খুশি খুশি ভাবটা চলে গেল। ঘুট ঘুটে অন্ধকার। কানে আসছে শুধু বাতাস আর ঢেউয়ের গর্জন। কে কার চেয়ে বেশি গজরাতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা লাগিয়েছে যেন। বেশি ভয় হতে লাগলো নৌকাটার জন্যে। আরো একটা ভয় আছে। যদি জলোচ্ছ্বাস আসে! তাহলে আর বাঁচতে হবে না! খাঁচায় বন্ধ ইঁদুরের অবস্থা হবে আমাদের।

সারাদিনের এতো পরিশ্রম আর ক্লান্তির পরেও ঘুম এলো না চোখে। সারাটা রাত জেগে বসেই কাটিয়ে দিলাম।

সে রাত কাটলো, পরের দিন কাটলো, তারপরের রাত গেল। থামলো না ভয়ানক ঝড়। বাতাসের বিরাম নেই বিন্দুমাত্র। ফুলে ফেঁপে উঠে ফুঁসছে সাগর। জলোচ্ছ্বাস আসবেই, যা মনে হচ্ছে!

মায়ের দেয়া বাইবেলটার কথা মনে পড়লো আজ হঠাৎ করেই। সঙ্গে নেই। জাহাজডুবিতে হারিয়েছি। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম।

আমার ডাক বোধ হয় শুনতে পেলেন ঈশ্বর। শেষ পর্যন্ত এলো না জলোচ্ছ্বাস।

তিন দিন তিন রাত পর থামলো ঝড়।

চতুর্থ দিন রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম। ভোরে চোখ মেলতেই দেখি, বাইরে সোনালি সকাল। বেরিয়ে এলাম খোঁড়লের বাইরে। সাগর আর আকাশের চেহারা দেখে মনেই হয় না বারো ঘণ্টা আগেও কি ভয়ানক ঝড় বইছিলো!

ইচ্ছে করলে নৌকা নামিয়ে নিতে পারি। কিন্তু গা কাঁপছে অজানা আশংকায়। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ করেই ঝড় এসে পড়ে এদিকের সাগরে। এই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরোবো, আবার যদি এসে পড়ে!

টিলার মাথায় চড়লাম। বাঁ দিকে চোখে পড়লো দ্বীপটা। মাইল দুয়েক দূরে। পেঙ্গুইন দ্বীপ।

আর দ্বিধা করলাম না আমরা। নৌকা নামিয়ে নিলাম।

আকাশ একেবারে পরিষ্কার। শিগগির আর ঝড় আসবে বলে মনে হয় না।

পেঙ্গুইন দ্বীপের দিকে নৌকা চালালাম। সঙ্গে অনেক দড়ি আছে। নতুন দড়ি দিয়ে পাল বাঁধলাম। শান্ত সাগরে তরতর করে এগিয়ে চললো নৌকা।

পেঙ্গুইন দ্বীপের পাশ কাটিয়ে ওপাশে আসতেই চোখে পড়লো আমাদের দ্বীপ, প্রবাল দ্বীপ।

হাওয়া পড়ে গেল হঠাৎ করেই। দাঁড় তুলে নিলাম আমরা।

বিকেল নাগাদ এসে পৌঁছুলাম প্রবাল প্রাচীরের বাইরের দিকে। জাহাজডুবি ফাটলের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা দুটো তারা ফুটতে শুরু করেছে আকাশে। ঝির-ঝিরে বাতাস।

বিশাল এক চাঁদ উঠলো পুবের আকাশে। সৈকতের ঝকঝকে শাদা বালিতে টেনে তুললাম নৌকাটা। বল্লম আর মুগুরগুলো তুলে নিয়ে ছুটলাম বাড়িতে।

পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে বানিয়েছি কুঁড়ে। ঝড়ের দাপট সব গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। আমাদের কুঁড়ের কিচ্ছু হয়নি। ভেতরে জিনিসপত্র যেভাবে যা রেখে গিয়েছিলাম, তেমনি আছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমাদের জান মাল সব সামলে রেখেছেন তিনি।

একুশ

পেঙ্গুইন দ্বীপ অভিযানের পর অনেক দিন আর বাইরে কোথাও বেরোলাম না।

পরের কয়েক মাস শান্তিতেই কাটালাম প্রবাল দ্বীপে। কখনো মাছ ধরি ল্যাগুনে, কখনো বনের ভেতরে শিকারে যাই। জলজ বাগানে ডুবসাঁতার কাটি, অ্যাকোয়ারিয়ামে জিয়ানো অদ্ভুত জীব দেখে সময় কাটাই।

ইদানীং মাঝে মাঝেই বাড়ির কথা বলে পিটারকিন। বুঝলাম, বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে তার। আমার তেমন ইচ্ছে নেই, জ্যাকেরও না। আরো কয়েক বছর কাটিয়ে যেতে পারি এখানে, খারাপ লাগবে না। তবু, প্রায়ই গিয়ে দাঁড়াই হীরক গুহার ওপরের বড় পাথরটায়। সাগরের দিকে চেয়ে থাকি। জাহাজ যায় কিনা, লক্ষ্য করি।

চমৎকার অবাহাওয়া যেন চিরবিরাজমান। সারা বছর ধরেই ফল দিচ্ছে কিছু কিছু গাছ। বনে, শুয়োরের সংখ্যা আরো বেড়েছে। আমরা তিন জন মানুষ আর কতো খাবো? একনাগাড়ে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে জানায়ারগুলো। বনে ঢুকলেই দেখা

মেলে। কষ্ট করে খুঁজতে হয় না। সেই যে, ছাতার মতো গাছটা, হলুদ ফল ধরে, ওটার তলায় যে কোনো সময় পাওয়া যায় কয়েকটাকে।

কাজকর্ম বিশেষ নেই এখন। তবু বসে থাকি না। নারকেলের গামছা দিয়ে কাপড় বানাচ্ছি। শুয়োর মেরে জুতো বানিয়েছি তিন জোড়া, আরো বানাচ্ছি। দেখতে খুবই বিচ্ছিরি হয়েছে, ঠিক, কিন্তু আসল জুতোর চেয়ে কম কাজ দিচ্ছে না।

একদিন, সাঁতার কাটছি আমি আর জ্যাক, হীরক-গুহার কাছের সাগরে। কোনো অজানা কারণে হাঙর আসে না এদিকে, অন্তত আজ পর্যন্ত দেখিনি একটাকেও।

'শিগগিরই মাছে পরিণত হবে তোমরা,' ওপরে দাঁড়িয়ে বললো এক সময় পিটারকিন। 'তারপর সাঁতরে চলে যাবে আমাকে একা ফেলে। জ্যাককে তো এখনি হাঙরের মতো দেখাচ্ছে!'

'কপাল ভালো, তুমি সাঁতার জানো না,' হেসে বললো জ্যাক। 'তাহলে সার্ডিন মাছ হয়ে যেতে। ওই রকমই হোঁৎকা।'

হেসে উঠলাম হো হো করে।

হাসতে গিয়েই সাগরের দিকে চোখ পড়লো পিটারকিনের। ভুরু কুঁচকে গেল দেখতে দেখতে। 'আরে! ওগুলো কি?'

'কি?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করলাম আমি আর জ্যাক।

'বুঝতে পারছি না!' বললো পিটারকিন। 'বুঝতে পারছি না! কালো কালো...ছুটো...পাখি হতে পারে না...আরো বড়...!'

তাড়াতাড়ি উঠে এলাম আমি আর জ্যাক।

দিগন্তের কাছে কালো ছুটো কি যেন ! এগিয়ে আসছে।

'তিমি !' বলেই চেঁচিয়ে উঠলো পিটারকিন, 'না না, তিমি না ! নৌকা...ছুটো...!' কপালে হাত রেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে সে।

নৌকা ! ও ছুটো নৌকা ! বুকের খাঁচায় ছুপদাপ লাফাতে শুরু করলো হৃৎপিণ্ডটা। আনন্দে! আবার বহু মানুষের সান্নিধ্য পাবো !

'নৌকা, কিন্তু নড়াচড়ার ধরণটা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না !' নিচু গলায় বিড়বিড় করলো জ্যাক। 'কেমন যেন অদ্ভুত !'

আরো এগিয়ে এলো নৌকা ছুটো।

'ক্যানো !' হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠলো জ্যাক। 'যুদ্ধের ক্যানো কিনা বলতে পারবো না ! তবে এটা জানি, যে কোনো ক্যানোতে চড়েই আসুক, ওরা মানুষখেকো ! দক্ষিণ সাগরীয় দ্বীপের সব মানুষই মানুষখেকো। আর, বিদেশীদের একদম দেখতে পারে না ওরা। জলদি কাপড় পরে নাও, রালফ, লুকিয়ে পড়া দরকার !'

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিলাম আমি আর জ্যাক। হীরক-গুহার একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। তিনদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে আছে ঝোপঝাড়। চট করে কারো চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

'সঙ্গে তো কোনো অস্ত্রই নেই আমাদের !' বললাম আমি।

'থাকলেও কোনো লাভ হতো না হয়তো,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো জ্যাক। 'তবে, সহজে ধরা দেবো না। লাঠিসোঁটা জোগাড় করে বাধা দেবো। আর, আশেপাশে পাথর তো আছেই।'

'আগে থেকেই জোগাড় করে রাখি কিছু,' বললাম।

'ঠিক বলেছো,' সায় দিলো জ্যাক।

তাড়াহুড়ো করে গোটা তিনেক মোটা শুকনো ডাল জোগাড় করে আনলাম আমরা। বেঁটে ডালগুলো মুগুরের কাজ দেবে। বেশ কিছু পাথরও তুলে এনে স্তূপ করে রাখলাম ঝোপের ভেতর। তারপর আগের জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম দুরুদুরু বুকে। চুপচাপ।

আরো কাছে এসে গেছে নৌকা। বোঝা যাচ্ছে, আগের ক্যানোটাকে তাড়া করে আনছে পেছনেরটা।

সামনেরটায় জনা চল্লিশেক যাত্রী, তার ভেতর কয়েকজন মহিলা আর শিশুও আছে। পেছনেরটায় শুধু পুরুষ। এটাতেও চল্লিশজনই হবে। অনেক বেশি অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত। ভয়ংকর চেহারা। দু'দলই দাঁড় বাইছে প্রাণপণে।

খানিক দূরে সৈকতে এসে থাঁচ করে লাগলো আগের ক্যানোটার তলা। লাফিয়ে তীরে নামতে শুরু করলো যাত্রিরা। চেঁচামেচি করছে। মোট তিন জন মেয়েমানুষ, দু'জন বয়স্ক, একজন তরুণী। বয়স্ক দুজনের কোলে বাচ্চা। সোজা বনের দিকে ছুটলো ওরা। পুরুষেরা বল্লম আর মুগুর হাতে দাঁড়িয়ে রইলো পানির ধারেই।

পৌঁছে গেল পেছনের ক্যানোটা। তীরে লাগার আগেই ঝপাঝপ লাফিয়ে অল্প পানিতে নেমে পড়লো আরোহীরা। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এলো পানি ভেঙে। আক্রমণের ভঙ্গিতে।

বেধে গেল যুদ্ধ।

বাইশ

প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

মুণ্ডরের ব্যবহারই বেশি হচ্ছে। সুযোগ পেলেই বসিয়ে দিচ্ছে একে অন্যের মাথায়। বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে প্রায় উলঙ্গ দেহগুলো। মানুষ না, সাক্ষাৎ শয়তান বলেই মনে হচ্ছে ওদেরকে। নিষ্ঠুর রক্তপাত দেখতে পারলাম না, চোখ ফিরিয়ে নিলাম অন্যদিকে। কিন্তু অদ্ভুত এক আকর্ষণ আবার আমার চোখকে টেনে ফেরালো যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

আক্রমণকারীদের সর্দারের চেহারা কুৎসিত দেখতে। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, শরীরের রঙ কয়লার মতো কালো। হলুদ লম্বা চুল, নিশ্চয় রঙ করা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিচিত্র রঙের উলকি। কালো মুখে উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ, ঝকঝকে শাদা দাঁত ভয়ংকর করে তুলেছে চেহারাটাকে। দুর্দান্ত যোদ্ধা। দেখতে দেখতে চারজন লোককে ধরাশায়ী করে ফেললো সে।

হঠাৎ হলুদ চুলওয়ালাকে আক্রমণ করে বসলো আরেকজন তারই মত লম্বা-চওড়া লোক। হাতে বিশাল গদা কাঠের তৈরি, মাথাটা ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, চোখা। মারাত্মক অস্ত্র।

দু'এক সেকেণ্ড পরস্পরের দিকে চেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। তারপর ঘুরতে শুরু করলো একে অন্যকে সামনে রেখে। তারপর প্রায় একই সঙ্গে লাফ দিলো দু'জন, গদা ঘুরিয়েই বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলো শত্রুর মাথায়। গদায় গদায় আঘাত লেগে ভোঁতা আওয়াজ উঠলো। টলে উঠলো হলুদ চুলওয়ালা। তার গায়ের ওপর এসে পড়লো অন্য লোকটা। ধাক্কা দিয়ে মাটিতে চিত করে ফেলে দিলো সর্দারকে। গদা তুললো মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু আঘাত হানার আগেই তার মাথায় এসে লাগলো বিরাট এক পাথর। ছুঁড়ে মেরেছে হলুদ চুলওয়ালার দলের একজন। হুঁশ হারিয়ে পড়ে গেল লোকটা। সে আগের কানোর লোক। আরেক সর্দার, চেহারা আর হাবভাবে তা-ই মনে হলো।

সর্দার কাবু হয়ে যেতেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সাহস হারিয়ে ফেললো দলের লোকেরা। ঘুরেই ছুট লাগালো বনের দিকে। তাদের পেছনে ছুটলো হলুদ চুলওয়ালার লোকেরা।

পরাজিত দলের একজনও পালাতে পারলো না। সব কজনকে ধরে নিয়ে এলো হলুদ চুলওয়ালার লোকেরা। বন্দিদের কাউকেই মারলো না ওরা। বরং বাঁচিয়ে রাখার দিকেই যেন নজর বেশি। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে একটা ঝোপের পাশে বালির ওপর শুইয়ে রাখলো পরাজিতদের। তারপর গিয়ে নামলো পানিতে। আঘাত কম-বেশি সবাই পেয়েছে। রক্ত আর বালি ধুয়ে ফেলতে লাগলো গা থেকে।

গুণে দেখলাম, মোট পনেরোজন বন্দি।

পানি থেকে উঠে এলো হুলুদ চুলওয়ালার লোকেরা। বাইশ জন। দুজনকে বনে পাঠিয়ে দেয়া হলো, মেয়ে আর শিশুদের ধরে আনতে।

দু'দলেই হতাহতের সংখ্যা প্রচুর।

'ব্যাটারা যদি এদিকে এসে পড়ে কোনো কারণে!' কানের কাছে ফিসফিস করে বললো পিটারাকন।

'চুপ!' চাপা গলায় বললো জ্যাক। 'একদম নড়বে না! যেখানে আছো, বসে থাকো!'

বসে রইলাম চুপচাপ। বুকের ভেতর টিপটিপ করছে হৃৎপিণ্ডটা।

কি যেন আলাপ-আলোচনা করলো বিজেতারা নিজেদের মধ্যে। তারপর আরো একজনকে পাঠিয়ে দিলো বনের ভেতর। শিগগিরই ফিরে এলো লোকটা। মাথায় শুকনো ডাল পাতার বোঝা।

জ্যাক প্রথম দিন যা করেছিলো, সেভাবে ধনুক আর শুকনো কাঠির সাহায্যে আগুন ধরিয়ে ফেললো একজন। আগুনের পাশে গোল হয়ে বসলো সবাই। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

দুজন লোক এসে এক বন্দিকে তুলে নিয়ে গেল। চিৎ করে ফেললো আগুনের পাশে।

কি করবে ওকে? জ্যান্ত পোড়াবে? শক্ত করে চেপে ধরলাম একটা লাঠি। উঠতে গিয়েও পারলাম না। কাঁধ চেপে ধরেছে জ্যাকের শক্তিশালী থাবা।

কি যেন আদেশ দিলো হলুদ চুলওয়ালা সর্দার।

মুণ্ডর হাতে উঠে এলো একজন যোদ্ধা। বন্দির কপাল সই করে লাগালো বাড়ি। এক বাড়িতেই চুরমার হয়ে গেল খুলি। ছিটকে বেরিয়ে এল রক্ত-মগজ। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল লোকটা। যাক, বেশি কষ্ট সইতে হলো না হতভাগাকে! জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলে তো...

মৃত লোকটার হাত-পা নড়া বন্ধ হওয়ার আগেই তাকে কেটে ফেলতে শুরু করলো জংলীগুলো। দেখতে দেখতে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো। চোখা কাঠির মাথায় মাংসের বড় বড় টুকরো গেঁথে ধরলো আগুনের ওপর। ঝলসানো তো দূরের কথা, গরমও হলো না ঠিক মতো, কামড়ে টেনে ছিঁড়ে খেতে শুরু করলো জানোয়ারগুলো।

পাক দিয়ে উঠলো পেটের ভেতর। বমি করে ফেললাম গল গল করে।

আমার বমির শব্দ ঢাকা পড়ে গেল তীক্ষ্ণ চিৎকারে। মুখ মুছতে মুছতে চেয়ে দেখলাম, বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে দুই জংলী, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে মেয়েমানুষগুলোকে।

সর্দারের সামনে এনে ওদের দাঁড় করিয়ে দিলো দুই জংলী। তারপর তাড়াহুড়ো করে গিয়ে বসলো খাবারের ভাগ নিতে।

হাতের অবশিষ্ট মাংসটুকু মুখে পুরে দিলো সর্দার। উঠলো। কুৎসিত হাসি হেসে এসে দাঁড়ালো একটা বয়স্কা মহিলার সামনে। হাত বাড়ালো কোলের বাচ্চাটার দিকে।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল মহিলা।

খিকখিক করে শয়তানী হাসি হাসলো সর্দার। এক লাফে এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলো বাচ্চাটাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিলো সাগরে।

চিৎকার করে উঠে বালির ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মা।

চাপা অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠলো জ্যাক। ওই সামান্য শব্দেই চমকে উঠে ফিরে চাইলাম। রক্ত সরে গেছে তার মুখ থেকে। কপালে ঘাম।

আবার ফিরে চেয়ে দেখলাম, শিশুটা তলিয়ে যায়নি। সৈকতে এনে ফেলেছে তাকে বিশাল এক ঢেউ। অসহায় শিশুটাকে গ্রাস করার মতো নিষ্ঠুর হতে-পারেনি যেন সাগরও, কোলে করে এনে নামিয়ে দিয়ে গেছে বালির ওপর, ডাঙায়। হাত-পা নড়ছে বাচ্চাটার, বেঁচে আছে।

তরুণীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো সর্দার। কি যেন বললো। ব্যাটাদের ভাষা জানি না, বুঝতে পারলাম না কিছুই।

জোরে জোরে মাথা নাড়লো মেয়েটা। পিছিয়ে এলো এক পা।

দাঁত বের করে হাসলো সর্দার। কি যেন বললো আবার। তারপর হাত তুলে আগুন দেখালো।

অনুমান করলাম, কোনো একটা প্রস্তাব দিয়েছে মেয়েটাকে সর্দার। এবং তার কথা না শুনলে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিচ্ছে।

আবার মাথা নাড়লো মেয়েটা। পিছিয়ে গেল আরেক পা।

ভয়ংকর হয়ে উঠলো সর্দারের মুখ। সঙ্গীদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে কিছু একটা আদেশ দিলো।

'পিটারকিন!' ফিসফিস করে বললো জ্যাক। 'ছুরিটা আছে না সঙ্গে?'

'আছে!' ফিসফিস করেই জবাব দিলো পিটারকিন। মরার মুখের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর চেহারাও।

'যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। আমি বেরিয়ে গেলেই তুমি চার রালফ ছুটবে। গিয়ে বাঁধন কেটে দেবে বন্দিদের। খুব তাড়াতাড়ি কাটবে, নইলে মরতে হবে সবাইকে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জ্যাক। হাতে মুগুর। রাগে উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে। ঘাম ঝরছে কপাল থেকে।

দেখলাম, মুগুর হাতে এগিয়ে আসছে জল্লাদ, সেই জংলীটা, যে বন্দিকে হত্যা করেছে। কাছে এসে মুগুর তুললো মেয়েটার মাথা সই করে।

ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলো জ্যাক। আঁতকে উঠলাম! এ কাকে দেখছি! হাসিখুশি আমাদের সেই বন্ধু! বিকট হয়ে উঠেছে চেহারা। দাঁতে দাঁত চেপে বসায় কঠিন হয়ে ফুলে উঠেছে চোয়ালের ওপর দিকের মাংস। আবার এক হুংকার ছেড়ে প্রায় পনেরো ফুট নিচে লাফিয়ে নামলো সে। মুগুর হাতে ছুটে গেল বাঘের মতো ক্রুদ্ধ গর্জন করে। চোখের পলকে গিয়ে পড়লো হতচকিত জংলীদের মাঝে।

আর দেখার অপেক্ষা করলাম না আমরা দুজন। ঝোপের

ভেতর দিয়ে ছুটে গেলাম। ছুটতে ছুটতেই দেখছি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা।

সামনে যে লোকটা পড়লো, এক বাড়িতে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো জ্যাক। মাথার ওপর ডালটা ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেল সর্দারের দিকে। কাছে পৌঁছেই আঘাত হানলো গায়ের জোরে। লাগলে, ছাতু হয়ে যেতো হলুদ চুলওয়ালার মাথা। কিন্তু চকিতে সরে গেল সে। আঘাতটা লাগলো কাঁধে। কাৎ হয়ে গেল এক পাশে। আহত জানোয়ারের মতো চেঁচিয়ে উঠে মুগুর তুললো।

আর দেখতে চাইলাম না। যা ঘটে ঘটুক, আগে বন্দিদের মুক্ত করতে হবে।

যতো তাড়াতাড়ি পারলাম, মুক্ত করে দিলাম ওদের। আমাদের সাহায্য করার ইঙ্গিত জানিয়েই ছুটলাম যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

প্রচণ্ড লড়াই চলছে হলুদ চুলওয়ালা সর্দার আর জ্যাকের মাঝে। কেউ কাউকে কাবু করতে পারছে না। চারপাশ থেকে তাদের ঘিরে রেখেছে জংলীরা।

এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নিহতদের অস্ত্রসস্ত্র। ছুটতে ছুটতেই হাত থেকে ফেলে দিলাম ডালটা। নিচু হয়ে তুলে নিলাম একটা মুগুর। পিটারকিন তুলে নিলো একটা বল্লম। চকিতে একবার পেছনে ফিরে চেয়ে দেখলাম, পেছনেই আছে চোদ্দজন লোক। যে যা পেরেছে, অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে।

আঘাত হেনেছে হলুদ চুলওয়ালা। শাঁই করে সরে গেল জ্যাক। ভারসাম্য হারিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল সর্দার। এই

সুযোগে তার ডান কাঁধে বাড়ি মারলো জ্যাক। হাড় ভাঙার কুৎসিত শব্দ হলো। আর্তনাদ করে উঠলো সর্দার। হাত থেকে খসে পড়ে গেল মুগুর। বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুলে রইলো ডান হাতটা।

আবার বাড়ি মারলো জ্যাক। খুলি ফাটিয়ে দিলো। হলুদ চুলওয়ালার। কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে আছড়ে পড়লো সে।

ক্ষণিকের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল জংলীরা। পরক্ষণেই ঘিরে ফেললো জ্যাককে। পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠে ছুটলাম আমরা। ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর।

সর্দার নেই। আচমকা এভাবে আক্রান্ত হয়ে হতচকিত হয়ে পড়লো জংলীরা। প্রথম চোটেই ধরাশায়ী হলো সাত জন।

নতুন বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বন্দিরা মুক্তি পেয়ে। এবার আর পেছন ফেরার কোনো লক্ষণ নেই ওদের মাঝে।

জ্যাকের লাঠির সামনে দাঁড়াতে পারছে না কেউ। তার ওপর রয়েছে পিটারকিনের বল্লম। শিগগিরই ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি অবস্থা হলো জংলীদের। যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে যে যেদিকে পারলো, দৌড় দিলো। কিন্তু পালাতে পারলো না। পেছন থেকে ছুঁড়ে দেয়া বল্লম বিঁধে মরলো কিছু, বাকিগুলোকে ধরে আনা হলো।

দেখতে দেখতে বেঁধে ফেলা হলো বন্দিদের। খানিক আগে এরাই ছিলো গর্বিত বিজেতা।

তেইশ

যুদ্ধ শেষ।

আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো নতুন বিজেতারা। অবাক চোখে দেখছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে বিচিত্র ভাষায়। একটা বর্ণও বুঝতে পারলাম না আমরা। কাজেই কোনো জবাব দিতে পারলাম না। হাঁ করে চেয়ে থাকাই সার হলো।

এগিয়ে এলো ওদের সর্দার। এই লোকটাকেই পাথর ছুঁড়ে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছিলো। জ্যাকের সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরলো জ্যাক। চাপ দিলো একটু। হৈ হৈ করে উঠলো জংলীরা। বুঝতে পারলো, আমরা ওদের বন্ধুত্ব চাই।

এইবার এগিয়ে এলো মেয়েটা। চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি।

সেই মহিলার ওপর চোখ পড়লো। পানির ধার থেকে বাচ্চাকে তুলে এনেছে। ভালোই আছে বাচ্চাটা। আমি ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়তেই ফোকলা হাসি হাসলো।

সর্দারের হাত ছেড়ে দিলো জ্যাক। কোলে তুলে নিলো

বাচ্চাটাকে। গোলগাল নাদুস-নুদুস। পেটে আঙুল দিয়ে আলতো খোঁচা দিতেই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

হেসে উঠলাম আমি আর পিটারকিনও। মায়ের চোখের কোণে টলোমলো করে উঠলো পানি। বিড় বিড় করে কিছু বললো আমাদের দিকে চেয়ে, বুঝলাম না। হয়তো আমাদের ভালো চেয়ে প্রার্থনাই জানালো ওদের দেবতার কাছে।

বাচ্চাটাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে সর্দারের হাত ধরলো আবার জ্যাক। টেনে নিয়ে এগোলো। পেছনে ফিরে ইশারা করলো সবাইকে, অনুসরণের নির্দেশ।

দলটাকে নিয়ে আমাদের কুঁড়ের দিকে চললাম।

জাহাজ উপত্যকায় পৌঁছে গেলাম শিগগিরই। কুঁড়ের সামনে এসে বসে পড়লো জংলীরা।

'ব্যাটাদের কিছু খাওয়ানো দরকার,' বললো জ্যাক। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

খিদে যে পেয়েছে, খাবার দিতেই বোঝা গেল। গপাগপ মুখে পুরে গিলতে লাগলো ওরা। ঝলসানো শুয়োর, হাঁস আর মাছ। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ নারকেল, রুটি ফল, আলু, মিষ্টি আলু আর অন্যান্য ফল। মানুষ নয়, যেন একেকটা রাক্ষস!

'আগে ভাবতাম, আমি বুঝি বেশি খাই,' বলে উঠলো পিটার-কিন। 'কিন্তু এই ব্যাটাদের যে কেউ একাই খেয়ে ফেলতে পারে আমাকে।'

জংলীদের খাওয়া শেষ হলে আমরা খেতে বসলাম। খাওয়া

সেরে কুঁড়ের বাইরে বেরিয়ে দেখি, হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতেই শুয়ে পড়েছে সবাই। সর্দারের নাক ডাকতে শুরু করেছে ইতি-মধ্যেই।

আমরাও ক্লান্ত। বেশি রাত করলাম না, সকাল সকালই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো। বাইরে বেরিয়ে দেখি, তখনো ঘুমোচ্ছে জংলীরা। ডেকে তুললাম ওদের।

আমার হাঁকডাকে জ্যাকের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেল এতো জংলী দেখে। ঘোমের ঘোর কেটে গেল পরক্ষণেই। মনে পড়ে গেল সব কথা।

কুঁড়েতে গিয়ে ঢুকলো জ্যাক। পিটারকিন তখনো ঘুমিয়ে আছে।

'এই যে, সাহেব,' পিটারকিনের গায়ে ঠেলা দিলো জ্যাক, 'উঠুন উঠুন, আর কতো ঘুমাবেন? আপনার দোস্তরা ওদিকে খাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। আর বেশি দেরি করলে আমা-দেরকেই ধরে খেয়ে ফেলবে।'

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসলো পিটারকিন। 'সকাল হয়ে গেছে। এই একটু আগেই তো ঘুমোলাম।'

খেতে বসে গেল জংলীরা। আরেকবার তাজ্জব হয়ে দেখ-লাম ওদের খাওয়া।

বাচ্চা কোলে নিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে শুয়োরের হাড় চিবাচ্ছে সেই মহিলা, যার বাচ্চাকে গতকাল পানিতে ফেলে

দেয়া হয়েছিলো। এগিয়ে গেল পিটারকিন। তার দিকে চেয়ে হাসলো বাচ্চাটা।

'হ্যালো, কয়লার টুকরা,' বললো পিটারকিন। 'একেবারে নিজের বাড়ি ভাবতে শুরু করে দিয়েছো দেখছি!'

জবাবে আবার হাসলো বাচ্চাটা। দু'হাত বাড়িয়ে দিলো। হেসে তাকে কোলে তুলে নিলো পিটারকিন। তাদের দিকে চেয়ে একবার হাসলো মা। তারপর আবার হাড় চিবানোয় মন দিলো।

জংলীরা খাচ্ছে। আমি আর জ্যাক আরেকবার কথা বলার চেষ্টা করলাম ওদের সঙ্গে। বৃথা। ওদের কথা আমরা বুঝলাম না, আমাদের কথা ওরা বুঝলো না।

কার কি নাম, এটা জেনে নেয়ার চেষ্টা করলো জ্যাক। সর্দারের সামনে বসে তাকে দেখিয়ে নিজের বুকে হাত রাখলো। জোরে বললো, 'জ্যাক!' আমাকে দেখিয়ে বললো, 'রালফ!' তারপর পিটারকিনের দিকে আঙুল তুলে বললো, 'পিটারকিন!'

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেল সর্দার। নিজের বুকে হাত রেখে চেঁচিয়ে বললো, 'টারারো...টারারো!'

এরপর একে একে প্রায় সব জংলীদের নামই জেনে নিলাম আমরা। তরুণীর নামও জানলাম, আভাটিয়া।

নাস্তা শেষ হলো। তাকে অনুসরণের ইঙ্গিত করলো জ্যাক।

জংলীদেরকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলাম আবার আমরা। গত বিকেলে বন্দিদের যেভাবে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম, তেমনি রয়েছে! আশ্চর্য্য! এক ব্যাটারও কিচ্ছু হয়নি। দিব্যি সুস্থ, চাঙ্গা।

কথায় বলে বেড়ালের জান শক্ত, এই ব্যাটাদের জান বেড়ালের চেয়ে হাজার গুণ শক্ত!

হোক বন্দি, কিন্তু আর না খাইয়ে রাখাটা অমানবিক হয়ে যাবে। ওদেরকে খাইয়ে দেবার ভার দিলাম টারারোর দলের ওপর। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই গপাগপ গিললো বন্দিরা।

কয়েকজন জংলীকে নিয়ে সৈকতের ধারে একটা ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জ্যাক। ইঙ্গিতে গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলো।

বুঝলো জংলীরা। ছুটে গিয়ে ক্যানো থেকে কয়েকটা দাঁড় নিয়ে এলো। নরম বালিমাটি। দাঁড় দিয়েই খোঁড়া যাবে। কাজ শুরু করে দিলো ওরা। তাদের সঙ্গে হাত লাগালো জ্যাক।

বড় একটা গর্ত খোঁড়া হয়ে গেল শিগগিরই।

সৈকতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশগুলো তুলে আনার ইঙ্গিত করলো জ্যাক।

সব কটা লাশ তুলে এনে গর্তে ফেললো জংলীরা। মাটি চাপা দিয়ে দিলো।

টারারো এসে দাঁড়ালো জ্যাকের সামনে। ইঙ্গিতে জানালো তারা যেতে চায়।

মাথা কাত করলো জ্যাক।

বন্দিদেরকে ক্যানোতে তুলতে সাহায্য করলাম আমরা। কয়েক দিন চলার মতো খাবার আর পানি তুলে দিলাম ক্যানোয়। পিটারকিন গিয়ে গোটা ছয়েক শুয়োর মেরে নিয়ে এসেছে, সব-

গুলোই দিয়ে দিলাম জংলীদের। যে রাক্ষস, ছুঁটাতেও ওদের দিন দুয়েকের বেশি চলবে বলে মনে হয় না।

এইবার যাবার পালা। আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো টারারো। ইঙ্গিতে তাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ করলো। মাথা নাড়লাম আমরা।

স্মারক চিহ্ন হিসেবে ছোটো একটা কাঠের টুকরোয় আমাদের তিনজনের নাম খোদাই করে তুলে দিলাম টারারোর হাতে। নারকেলের ছোবড়ার সরু দড়িতে টুকরোটা বেঁধে নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখলো সে।

ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে, জংলীদের হাবভাবেই বোঝা গেল সেটা। আমাদেরকে সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানালো আবার টারারো। রাজি হলাম না। এগিয়ে এসে জ্যাকের সামনে দাঁড়ালো সে। তার নাকের সঙ্গে নাক ঘষলো তিন বার। এগিয়ে এলো আমার কাছে। নাক ঘষলো। তার পর গিয়ে দাঁড়ালো পিটারকিনের সামনে।

এটা ওদের বিদায়-রীতি, বুঝতে পারলাম। একে একে সব কজন জংলীর সঙ্গেই নাক ঘষাঘষি করতে হলো, এমনকি মেয়েদের সঙ্গেও। মায়ের কোল থেকে সেই বাচ্চাটাকে তুলে নিলো জ্যাক। ওর নাকের সঙ্গে নাক ঘষলো। বাচ্চাটা হাসছে, কিন্তু জ্যাকের চোখের কোণ একটু যেন ভিজে ভিজে মনে হলো।

অদ্ভুত এই পৃথিবী। সবচেয়ে অদ্ভুত বোধ হয় মানুষ জাতটা। গত বিকেলে যাদের কাণ্ডকারখানা দেখে শিউরে উঠেছিলাম,

তারাই যখন চলে গেল, ভারি হয়ে গেল মনটা।

চলে যাচ্ছে ছুটো ক্যানো। অনেক দূরে গিয়ে শেষবারের মতো একবার হাত নাড়লো জংলীরা। আমরাও হাত নেড়ে জবাব দিলাম।

ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল ক্যানো ছুটো। তারপরও আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা একভাবে। চারদিকটা ভীষণ নির্জন মনে হচ্ছে, বড় বেশি নীরব। হঠাৎই মনে পড়লো বাড়ির কথা। প্রবাল দ্বীপে আসার পর বাড়ির কথা ভেবে মন খারাপ করলাম এই প্রথম।

'চলো, কুঁড়েয় ফিরে যাই,' বিষণ্ণ গলায় বললো জ্যাক।

ফিরে চললাম আমরা।

চব্বিশ

দিন যেতে লাগলো।

পরিবর্তন এসেছে আমাদের মাঝে। আগের মতো আর ভালো লাগে না এই দ্বীপ। খালি মনে হয়, কি যেন নেই! দেশের কথা, বাড়ির কথা আলোচনা করি আমরা এখন প্রায়ই। রোজই গিয়ে দাঁড়াই হীরক-গুহার ছাতে। জাহাজ যায় কিনা, লক্ষ্য করি।

জংলীরা এসে দুটো ব্যাপার মনে করিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের: যতোখানি নিরাপদ ভেবেছিলাম, প্রবাল দ্বীপ মোটেই তা নয়, যে কোনো সময় ভয়াবহ বিপদ এসে হাজির হতে পারে এখানে। এবং সেজন্যে সব সময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

তেমন বিপদ এসে হাজির হলে, জাহাজ উপত্যকার কুঁড়েতে থাকা যাবে না। তখন আমাদের জন্যে সারা দ্বীপে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হীরক-গুহা। ওখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে হলে দরকারী যা যা দরকার—খাবার, আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা, পানি, এসব রাখতে হবে। রাখলাম, প্রচুর পরিমাণে শুকনো মাংস, শুকনো ফল, এবং নারকেল। একদিনের জন্যে বাইরে না বেরিয়েও কয়েক মাস একনাগাড়ে কাটিয়ে দিতে পারবো, এতো রসদ

নিয়ে ছুরেছি হীরক-গুহার পাশের একটা শুকনো গুহায়।

একদিন জলজ বাগানে সাঁতার কেটে কেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি আর জ্যাক। উঠে এসে বালিতে শুয়ে জিরিয়ে নিচ্ছি। পিটারকিন বসে আছে পাথরের টিলার মাথায়। সাগর দেখছে। ওখান থেকেই কথা বলছে আমাদের সঙ্গে।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল পিটারকিন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরেই চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'জ্যাক রালফ! পাল...পাল দেখা যাচ্ছে! একটা জাহাজ! এদিকেই আসছে!'

তাড়াহুড়ো করে উঠে এলাম টিলার মাথায়, পিটারকিনের পাশে। ঠিকই। একটা স্কুনার। দখিনা বাতাসে পাল তুলে দিয়ে রাজহংসীর মতো ভেসে আসছে এদিকেই।

উত্তেজনায় পাগলের মতো চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। টিলার মাথায়ই ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো পিটারকিন।

একনাগাড়ে এগিয়ে এলো জাহাজ। ঘণ্টাখানেকের ভেতরই পৌঁছে গেল প্রবাল প্রাচীরের ওপাশে। প্রধান পাল নামিয়ে দেয়া হলো। আমাদের দিকে নাক করে এগিয়ে আসছে জাহাজটা ধীরে ধীরে। প্রাচীরের কাছাকাছি পৌঁছেই নামিয়ে ফেলা হলো সবকটা পাল। চুপচাপ ভেসে রইলো জাহাজ।

জংলীদের মতোই লাফঝাঁপ শুরু করলাম আমরা, হাত নাড়াতে লাগলাম, সেই সঙ্গে চেঁচামেচি। জাহাজের ডেকে কয়েকজন নাবিক। আমাদের দিকেই মুখ। এক মুহূর্ত এদিকেই চেয়ে রইলো

বোধ হয় ওরা। তারপর ফিরে গেল। একটু পরেই দেখলাম, নৌকা নামানো হচ্ছে।

'আমাদের দেখেছে ওরা,' চেঁচিয়ে বললো পিটারকিন। 'নিতে আসছে!'

এরপর প্রায় একই সঙ্গে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা।

পতাকা উঠে যেতে দেখলাম দড়ি বেয়ে প্রধান মাস্তুলের মাথায়। পরক্ষণেই জাহাজের একপাশে কালচে-শাদা ধোঁয়ার একটা ফুল ফুটলো। এক সেকেণ্ড পরেই কানে এলো গুরুগম্ভীর আওয়াজ। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ঠিক পাশের টিলার মাথায় পড়লো এসে কামানের গোলা। খানিকটা জায়গার পাথর গুঁড়িয়ে ভেঙ্গে তছনছ করে দিলো।

বরফের মতো জমে গেলাম যেন। পতাকাটা চড়ে বসেছে মাস্তুলের মাথায়। ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপছে থিরথির করে। কালো রঙ। শাদা রঙে আঁকা মানুষের হাড়ের ক্রসের ওপর বসে আছে একটা খুলি। সাগরের আতংক, জলি রোজার—জলদস্যুদের পতাকা।

'জলদস্যু!' প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম তিনজনে।

তীরের মতো ছুটে আসছে হালকা নৌকা। ফাটলের কাছে পৌঁছে গেছে। এখুনি ঢুকে পড়বে জাহাজডুবি ল্যাগুনে।

জ্যাকের দিকে তাকালাম। 'কি করবো এখন?'

'লুকিয়ে পড়তে হবে।' চাপা গলায় বললো জ্যাক। 'ওদের হাতে পড়া চলবে না কিছুতেই। এসো, জলদি!'

টিলা থেকে নেমে বনে ঢুকে পড়লাম। আগে আগে ছুটলো জ্যাক একটা সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে। পিছু নিলাম আমরা। শিগগিরই চলে এলাম হীরক-গুহার ছাতে। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে সাবধানে উঁকি দিলাম।

জাহাজ উপত্যকার সৈকতের কাছে পৌঁছে গেছে নৌকা। তীরে ঠেকলো, লাফিয়ে বালিতে নেমে পড়লো কয়েকজন লোক। ছুটে গেল আমাদের কুঁড়ের দিকে।

মিনিটখানেক পরেই ফিরে আসতে দেখলাম ওদেরকে। এক-জনের হাতে অন্ধ বেড়ালটা। লেজ ধরে মাথার ওপরে তুলে বন-বন ঘোরালো সে বেচারা জীবটাকে, হাতের মুঠি হঠাৎ আলগা করে ফেললো। উড়ে গিয়ে সাগরে পড়লো বেড়ালটা। কয়েক মুহূর্ত ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে ডুবে গেল। হো হো হাসির শব্দ এসে কানে পৌঁছলো আমাদের।

'ব্যাটাদের কাছে কেমন ব্যবহার পাবো, বুঝতে পেরেছো তো!' তিক্ত কণ্ঠে বললো জ্যাক। 'হীরক-গুহায়ই লুকাতে হবে আমা-দের!'

'আমার কি হবে?' বলে উঠলো পিটারকিন। 'আমি তো ডুব-সাঁতার জানি না···'

'আমরা নিয়ে যাবো তোমাকে,' বাধা দিয়ে বললো জ্যাক। "মন শক্ত করে নাও। লুকানোর নিরাপদ আর কোনো জায়গা নেই আমাদের।'

ঢোক গিললো পিটারকিন। 'ঠিক আছে। এসো, যাই!'

বসে বসে এগোলোম। চলে এলাম সেই পাথরটার কাছে, যেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি আর জ্যাক। আমরা দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার শোনা গেল। ব্যাটারা দেখতে পেয়েছে আমাদের।

আর দেরি করা যায় না। দু'দিক থেকে পিটারকিনের দু'বাহু শক্ত করে ধরলাম আমি আর জ্যাক।

'ভয় নেই, পিটারকিন,' বললো জ্যাক। 'মোটেই কঠিন কাজ না। বড় করে দম নাও...কোনো রকম গোলমাল করবে না পানির তলায়। আমরাই নিয়ে যাব তোমাকে।'

মাথা কাত করে সায় জানালো পিটারকিন। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। স্থির চোখে চেয়ে আছে পানির তলার সবুজ নড়াচড়ার দিকে।

'রেডি!' বলে উঠলো জ্যাক। 'ওয়ান...টু...থ্রী!'

একই সঙ্গে ঝাঁপ দিলাম তিনজনে।

কোনো রকম গোলমাল করলো না পিটারকিন। আমাদের দুজনের মাঝে চুপচাপ শরীর সোজা করে রইলো। তীরের মতো সুড়ঙ্গ ধরে এগোলাম আমরা ওকে নিয়ে। পৌঁছে গেলাম গুহার ভেতরে।

ভেসে উঠলাম নিরাপদেই।

পিটারকিনের কোনো ক্ষতি হয়নি। এক ঢোক পানিও খায়নি। দম বন্ধ করে রেখেছিলো ঠিক মতোই। রীতিমতো দুঃসাহস দেখিয়েছে সে। ওর মতো সাঁতার না জানলে, অন্যের ওপর ভরসা

করে কিছুতেই ডুব দিতে পারতাম না আমি।

তাকে এসে উঠলাম আমরা। সেখান থেকে নামলাম গুহার শুকনো মেঝেতে। পাশের গুহাটায় ঢুকে পড়লাম।

আগুন জ্বাললো জ্যাক।

ঝিকমিক করছে রঙিন প্রবাল। আমাদের মুখে অনেকবার শুনেছে, কি দেখতে পাবে জানা আছে, তবু বিস্ময় চাপা দিতে পারলো না পিটারকিন। হাঁ করে চেয়ে রইলো সে অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে।

বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিছুই জানি না। দস্যুরা কি পানিতে ঝাঁপ দিতে দেখেছে আমাদের? এই গুহাটা কি আবিষ্কার করতে পারবে?

অনিশ্চিত এক পরিস্থিতি। অনেকক্ষণ কেটে গেল। এলো না দস্যুরা। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ওরা আসুক বা না আসুক, আগে খেয়ে নেবো ঠিক করলাম। তারপর যা হয় হবে। কপালের লিখন খণ্ডানো যাবে না।

খেয়ে নিলাম। বাইরে নিশ্চয় রাত নামছে এখন। এই বদ্ধ গুহার ভেতরে কিছুই করার নেই। শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলে প্রথমে বুঝতেই পারলাম না কোথায় আছি! তারপর একে একে সব মনে পড়লো। উঠে এসে পাশের প্রধান গুহাটায় ঢুকলাম। আবছা আলো আসছে মাথার ওপরের একটা সরু ফাটল দিয়ে। তারমানে, বাইরে এখন দিন।

ফিরে এসে জাগালাম জ্যাক আর পিটারকিনকে।

নাস্তা সারলাম।

'এভাবে বসে থাকতে পারবো না,' বললো জ্যাক। 'বাইরে গিয়ে দেখতে হবে, কি অবস্থা! আমিই যাচ্ছি।'

'না,' বলে উঠলাম। 'জ্যাক, তুমি থাকো। এর আগে প্রতিবারেই প্রথম ঝুঁকি নিয়েছো তুমি। একটা ঝুঁকি অন্তত আমাকে নিতে দাও।'

'ঠিক আছে,' হাসলো জ্যাক। 'কিন্তু সাবধান! চারদিকে কড়া নজর রাখবে!'

'রালফ, তোমার দোহাই, ধরা পড়ো না ওদের হাতে!' বলে উঠলো পিটারকিন।

তাকের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম পানিতে। এক ডুবে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে, ভুসস করে মাথা তুললাম। ভেসে রইলাম চুপচাপ। কান খাড়া। পাথরের গায়ে ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল বাড়ি মারছে পানি। বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কাকাতুয়ার কর্কশ চিৎকার। দস্যুদের সাড়া নেই।

ধীরে ধীরে সাঁতরে এসে থামলাম পাথরের দেয়ালের ধারে। ওপরের দিকে তাকালাম একবার। নীল আকাশ চোখে পড়লো। অনেক ওপরে ঘুরে ঘুরে চক্কর দিচ্ছে একটা অ্যালবাট্রস। শেকড় বেয়ে সাবধানে উঠে এলাম ওপরে।

সাগরের দিকে চেয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম আনন্দে। অনেক দূরে চলে গেছে স্কুনারটা। দিগন্তের কাছে পৌঁছে গেছে প্রায়।

'চলে গেছে! চলে গেছে!' একা একাই চেঁচাতে লাগলাম।

'ব্যাটারা ধরতে পারেনি...'

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, পেছনে খসখস শব্দ শুনলাম। কাঁধ চেপে ধরলো একটা কঠিন থাবা।

'পেরেছি!' কানের কাছে বলে উঠলো ভারি মোটা একটা কণ্ঠ। 'ধরতে পেরেছি।'

পঁচিশ

লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এলো যেন হৃৎপিণ্ডটা। পাঁই করে ঘুরলাম। ঝটকা লেগে কাঁধের ওপর থেকে সরে গেল হাত। আমি ঘুরে দাঁড়াতেই প্রচণ্ড এক চড় লাগলো নাকে মুখে।

চোখে শর্ষে ফুল দেখলাম কয়েক মুহূর্ত। হাবা হয়ে গিয়েছি যেন। পানি বেরিয়ে এলো চোখে। তার ভেতর দিয়েই দেখলাম, কার হাতে পড়েছি।

বিশাল এক দানব যেন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। শ্বেতাঙ্গ। কড়া রোদ আর নোনা হাওয়ায় তামাটে হয়ে গেছে মুখের চামড়া। লম্বা নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, চোখা। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ হালকা ধূসর। সাধারণ নাবিকের পোশাক পরনে। তফাৎ শুধু, কোমরে একটা মোটা চামড়ার বেল্ট, এক-পাশে পিস্তল গোঁজা, অন্যপাশে ভারি একটা ছুরি, ছোটোখাটো তরবারির সমান। কাটলাস বলে ওগুলোকে।

'খবরদার!' হুঁশিয়ার করলো লোকটা কর্কশ গলায়। 'কোনো চালাকি নয়।' পরক্ষণেই মুখে দুই আঙুল পুরে শিশ দিয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এলো। পাথুরে দেয়ালের এক প্রান্তের

একটা খাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো নৌকা। আমি যেখান দিয়ে উঠেছি, তার কাছেই এসে থেমে পড়লো।

'সৈকতে চলে যাও,' নৌকার লোকদের আদেশ দিলো দানবটা।

ওরা নৌকা নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

'সৈকতে চলো,' আমাকে বললো লোকটা। 'পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি খাবে।'

পালাতে পারবো না, বুঝতেই পারছি। কাজেই সে চেষ্টা করলাম না। পরে হয়তো সুযোগ পেয়েও যেতে পারি। হেঁটে চললাম তার আগে আগে।

আমাদের আগেই জাহাজ উপত্যকায় পৌঁছে গিয়েছে নৌকা। বালিতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন নাবিক, ভয়ংকর চেহারা।

'আগুন জ্বালাও, ধোঁয়া করো,' আদেশ দিলো দানবটা।

আদেশ পালন করতে ছুটে এলো একজন। কয়েক মিনিটেই লতা পাতা জোগাড় করে আগুন ধরিয়ে ফেললো। কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠে গেল আকাশে।

হঠাৎ কানে এলো কামানের গর্জন, সাগরের দিক থেকে। কি করে বোকা বানানো হয়েছে আমাকে, বুঝতে পারলাম। আগুন জ্বালিয়ে ইঙ্গিতে ডাকা হয়েছে জাহাজকে, ওটা থেকেই কামান দেগে সাড়া দেয়া হয়েছে। চেয়ে দেখলাম, নাক ঘুরে গেছে স্কুনারের। এগিয়ে আসছে।

আমাকে ঘিরে ধরলো দস্যুরা। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ সব

কটার। কোমরের বেল্টে পিস্তল, কাটলাস। কারো হাতে বন্দুক। কথা বলার সময় দানবটাকে ক্যাপ্টেন সম্বোধন করছে ওরা।

'আর দুই ছোকরা কোথায়?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো আমাকে এক ডাকাত।

ওর গলার স্বরেই এমন কিছু একটা রয়েছে, কাঁটা দিয়ে উঠলো আমার গা।

'তিনটে ছিলো, দেখেছি!' বলে উঠলো আরেকজন।

আমার দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। 'কি বলছে ওরা, কানে ঢুকছে? অন্য দুটো ইবলিস কোথায়?'

'বলবো না!' নিচু গলায় বললাম।

হা হা করে হেসে উঠলো ওরা।

টান মেরে পিস্তল খুলে আনলো ক্যাপ্টেন। 'নষ্ট করার সময় নেই। থাম্ব-স্ক্রুর স্বাদ পেলেই মুখ খুলে যাবে। সুড়সুড় করে কথা বেরিয়ে আসবে পেট থেকে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে দেবো ফেলে পানিতে, হাঙরের সঙ্গে গিয়ে দোস্তী করবে!' ডাকাতদের দিকে তাকালো সে। 'নৌকায় তুলে নাও ওকে।'

দুদিক থেকে আমার বাহু খামচে ধরলো দুই ডাকাত। এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নিয়ে এগোলো। প্রায় ছুঁড়ে ফেললো নৌকায়। ভীষণ জোরে পাটাতনে ঠুকে গেল মাথা। অন্ধকার দেখলাম দুনিয়া।

একটু সুস্থির হয়ে দেখতে পেলাম, ল্যাগুন পেরিয়ে এসেছে নৌকা। ফাটল দিয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রবাল প্রাচীরের বাইরে চলে এলো নৌকা। জাহাজের

গায়ে এসে ভিড়লো।

আমার কোমরে লাথি মারলো এক ডাকাত। জাহাজে চড়ার আদেশ দিলো।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। কোনোমতে উঠে এলাম ডেকে। পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে উপুড় করে ফেলে দিলো এক শয়তান।

তুলে ফেলা হলো নৌকা। নাক ঘুরে গেল জাহাজের। চমৎকার বাতাস। ফুলে উঠলো পাল। প্রবাল দ্বীপ পেছনে ফেলে তরতর করে এগিয়ে চললো স্কুনার।

ডাকাতরা সবাই ব্যস্ত। আমার দিকে খেয়ালই নেই কারো। ঝাঁপিয়ে পড়বো কিনা ভাবছি। কিন্তু রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চেয়েই বাতিল করে দিলাম ইচ্ছেটা। হাঙর!

বন্ধুদের ছেড়ে কোথায় চলেছি, কে জানে! আর হয়তো কোনোদিন দেখা হবে না ওদের সঙ্গে! কেঁদে ফেললাম। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামলো পানির ধারা।

'মেয়েমানুষের মতো কাঁদছে!' চমকে উঠলাম ক্যাপ্টেনের ভারি গলা শুনে। ফিরে তাকাতেই মুখ বাঁকালো সে। 'নাও, আরো কান্নার খোরাক,' বলেই ধাঁই করে আমার কানের ওপর এক ঘুসি বসিয়ে দিলো।

ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো কান। ডেকের ওপর পড়ে গেলাম।

'ন্যাকামি রেখে নিচে যাও এখন!' খেঁকিয়ে উঠলো ক্যাপ্টেন। 'আমি না ডাকলে আর আসবে না এখানে।'

হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলাম প্রচণ্ড রাগে। স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠে ঘুসি পাকিয়ে ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেনের দিকে।

আলগোছে আমার হাতটা ধরে ফেললো ক্যাপ্টেন। ভয়ানক এক মোচড় লাগালো। মনে হলো, কাঁধের কাছে ভেঙে গেছে হাড়। প্রচণ্ড যন্ত্রণা। কিন্তু টুঁ শব্দ করলাম না।

'ইঁদুরের বাচ্চা!' আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেন। 'সাহস তো কম না!'

হিসিয়ে উঠে থু-থু ছিটিয়ে দিলাম তার মুখে।

দপ করে জ্বলে উঠলো ক্যাপ্টেনের চোখ। নির্ঘাত এইবার গুলি করে মারবে আমাকে। মারুকগে, পরোয়া করি না আর।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ হাত ছেড়ে দিলো সে। হাসলো। ঘুরে গটগট করে হেঁটে চলে গেল ডেকের ওপর দিয়ে। নিচে নেমে গেল। বোধহয় মুখ ধোয়ার জন্যে।

খানিক পরেই ডেকে উঠে এলো এক নাবিক। নিচে যেতে ডাকলো।

নেমে এলাম। খেতে বসেছে নাবিকেরা। আমাকে দেখেই হেসে উঠলো।

'এক নম্বরের বিচ্ছু!' বললো একজন। 'তবে এরকম ছেলেই দরকার। এই যে, আমাদের বিলের কথাই ধরো না। ওর চেয়ে বেশি গোঁয়ার ছিলো। ধরে আনার পর লাথিই মেরে বসেছিলো ক্যাপ্টেনকে। সাহস বটে। তবে এ-ও ঠিক, আমরা যে কাজ করি, সাহস না থাকলে কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম!'

আবার হাসলো ওরা।

'বিচ্ছুটাকে কিছু খেতে দাও,' বললো আরেকজন। 'আধমরা দেখাচ্ছে। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।'

একটা প্লেটে শুয়োরের সেদ্ধ মাংস আর মিষ্টি আলু নিয়ে ঠেলে দিলো একজন। খিদে পেয়েছে। অযথা জেদ দেখিয়ে না খেয়ে থাকার কোনো মানে নেই। বসে পড়লাম ওদের সঙ্গে।

সারাক্ষণ বকর বকর করে গেল ওরা, কথায় কথায় বিচ্ছিরি সব গাল দিচ্ছে। কিন্তু একটা লোক একেবারে চুপচাপ। নীরবে খেয়ে চলেছে। তাকাচ্ছেও না কারো দিকে। লম্বা-চওড়ায় ক্যাপ্টেনের সমানই প্রায়। ওরই নাম বিল।

সারাটা দুপুর আর বিকেল একা একা বসে রইলাম। সূর্য ডোবার একটু আগে ঢুকলো বিল। উল্টোদিকের একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো চুপচাপ। আমার চোখে চোখ পড়তেই মৃদু হাসলো।

সাঁঝ হলো। ডেকের রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে চেঁচিয়ে বললো এক নাবিক, 'বিল, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দাও। ক্যাপ্টেন ডাকছে।'

'যাও, খোকা। চেহারাটাকে এমন মেয়েমানুষের মতো করে রেখো না,' বললো বিল। উঠে এসে বিরাট এক থাবা ফেললো আমার কাঁধে। চাপ দিলো। 'বুক ফুলিয়ে কথা বলবে।'

সিড়ি বেয়ে উঠে এলাম। কারো দিকে তাকালাম না। সোজা হেঁটে চললাম জাহাজের সামনের দিকে, ক্যাপ্টেনের কেবিনে।

দরকার ছিলো না, তবুও কেবিন দেখিয়ে দিলো আমাকে একজন।

ঢুকে পড়লাম। ছোট্ট ঘর। অতি সাধারণ আসবাবপত্র। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে বাতি। বাতির তলায় টেবিলে চার্ট। ছোটো টুলে বসে গভীর মনোযোগে দেখছে ক্যাপ্টেন। কাছে এগিয়ে দেখলাম, প্রশান্ত মহাসাগরের চার্ট।

আমার সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালো ক্যাপ্টেন। 'কি নাম?'

'রালফ রোভার।'

'যা জিজ্ঞেস করবো, সাফ সাফ জবাব দেবে। কোনোরকম মিছে কথা শুনতে চাই না...'

'মিথ্যে বলার অভ্যেস নেই আমার।'

ঠাণ্ডা হাসি হাসলো ক্যাপ্টেন। তারপর প্রশ্ন করে গেল একের পর এক। বাড়ি কোথায়? কি করে ওই দ্বীপে গেলাম? সঙ্গী কজন? এমনি সব প্রশ্ন।

একে একে তার সব প্রশ্নের জবাবই দিলাম। গোপন রাখলাম শুধু হীরক-গুহার কথা।

মাথা ঝোঁকালো ক্যাপ্টেন। 'তোমার কথা বিশ্বাস করছি আমি।'

তার এই কথায় রীতিমতো অবাক হলাম। যা বলেছি, সত্যিই বলেছি। এতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে কেন, বুঝতে পারলাম না।

'কিসে তোমার ধারণা হলো,' আবার বললো ক্যাপ্টেন, 'এটা জলদস্যুদের জাহাজ?'

'কেন, ওই কালো পতাকা !' বললাম। 'তাছাড়া ব্যবহার। প্রথমেই যে রকম মারধোর শুরু হয়ে গেল, ডাকাতরাই শুধু তা করে...'

ভুরু কোঁচকালো ক্যাপ্টেন। 'সৎসাহস আছে তোমার, ছেলে। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক। তবে তার কারণও আছে। আমাদের অনেক সময় নষ্ট করেছো তোমরা লুকিয়ে থেকে। আর কালো পতাকা ? ওটা একটা রসিকতা। অচেনা লোকের সঙ্গে প্রায়ই এই রসিকতা করে আমার নাবিকেরা। আমরা জলদস্যু নই। ব্যবসায়ী। তবে এদিকের সাগরে জলদস্যুদের ভয় খুব বেশি, সব সময়ই তাই হুঁশিয়ার থাকতে হয় আমাদের। অস্ত্র রাখতে হয় সঙ্গে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর চন্দন কাঠ পাওয়া যায়। তারই ব্যবসা করি আমি। তুমি আমাদের দলে ভিড়ে যাও, চুপচাপ থাকো, ভালোমতো কাজ শেখো, করো। ভালো বখরা পাবে। তবে হ্যাঁ, যথেষ্ট বিপদ আছে এ-কাজে। প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়ে যায় একেক সময়।...তো, রাজি ?'

ক্যাপ্টেনের খোলাখুলি কথাবার্তায় অবাক হলাম। আরো অবাক হলাম, এটা জলদস্যুদের জাহাজ নয় শুনে। প্রশ্ন করলাম, 'আপনারা যদি ভালোমানুষই হবেন, আমাকে ধরে এনেছেন কেন ? আর রসিকতাই যদি হয়ে থাকে, ভয় দেখানোর পর আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসেননি কেন ?'

হাসলো ক্যাপ্টেন। 'রাগের মাথায় একটা অন্যায় করে ফেলেছি, খোকা। দুঃখিত। এখন তো অনেক দূরে চলে এসেছি। ফিরে

গেলে অনেক সময় নষ্ট। তবে কথা দিচ্ছি, ফিজি থেকে কাঠ নিয়ে ফেরার পথে তোমাকে প্রবাল দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে যাবো। যদি চাও, তোমার বন্ধুদের সহ তুলে নিয়ে পৌঁছে দেবো দেশে।'

চুপ করে রইলাম।

আরো কিছু কথা বললো ক্যাপ্টেন।

অবশেষে তার জাহাজে নাবিকের কাজ করতে রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু কেন জানি না, মনে একটা খটকা থেকেই গেল আমার।

ছাব্বিশ

তিন হপ্তা পেরিয়ে গেল।

একদিন কোয়ার্টার ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছি। জাহাজের চার-পাশে খেলা করছে একদল ডলফিন। সাগর শান্ত। আকাশে মেঘ নেই। বাতাস নেই এক রত্তি। ঝুলে পড়েছে পাল। দুলুনির সঙ্গে নড়ছে মাস্তুল, মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

বেশির ভাগ নাবিকই নিচে ঘুমোচ্ছে। কেউ কেউ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ডেকে, কেবিনের ছায়ায়। হালের চাকা ধরেছে বিল। তারও বিশেষ কিছু করার নেই। জাহাজের গতি নেই বললেই চলে। কোনোদিকেই হাল ঘোরাতে হচ্ছে না তাকে। চাকা ছেড়ে দিয়ে উঠে এলো সে একসময়, আমার পাশে।

'খোকা,' হঠাৎ বলে উঠলো বিল, 'এ-জাহাজ তোমার জায়গা নয়।'

'জানি,' বললাম, 'কিন্তু ক্যাপ্টেন কথা দিয়েছে, কাজ সেরে ফিরে যাবার পথে আমাকে প্রবাল দ্বীপে পৌঁছে দেবে।'

'আর কি কি বলেছে?' গলার স্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো বিল।

'বলেছে, ও একজন ব্যবসায়ী। কাজে যোগ দিলে নাকি লাভের অংশ দেবে আমাকে।'

মুখ বাঁকালো বিল। 'ও ওরকম বলেই! খালি মিছে···'

বাধা পেয়ে থেমে গেল বিল। লুকআউট থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'পাল! পাল দেখা যাচ্ছে!'

প্রধান মাস্তুলের মাথায় ঝোলানো মাচার দিকে তাকালাম, সেখানে বসে আছে পাহারাদার।

দুই লাফে হালের চাকার কাছে ফিরে গেল বিল। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়? কোন দিকে?'

'ডানে, একেবারে দিগন্তের কাছে!' ওপর থেকে এলো জবাব।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডেকে শোয়া প্রতিটি লোক। নিচেও হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। শিকারি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ডেকে উঠে আসছে একের পর এক নাবিক। বেরিয়ে এসেছে ক্যাপ্টেন।

ওপরের দিকের পাল সব আবার তুলে দেয়া হলো। উদ্বিগ্ন চোখে ঘন ঘন পেছনে তাকাচ্ছে ক্যাপ্টেন, ভুরু কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছে কিছু। দেখা গেল শিগগিরই। পেছনে অনেক দূরে আকাশের রঙ অন্যরকম, ঘন নীল একটা চাদর ঝুলে আছে যেন দিগন্তের কাছাকাছি। নিচের সাগর কেমন ফোলা। তারমানে, বাতাস আসছে।

এসে গেল বাতাস। ধাক্কা দিয়ে ফুলিয়ে দিলো পাল। থরথর করে কেঁপে উঠলো স্কুনার। প্রায় লাফ দিয়ে আগে বাড়লো। বিলের হাতে ঘুরে যেতে লাগলো হালের চাকা।

নাক ঘুরে গেল জাহাজের, খানিকটা ডানে মোড় নিলো। পুরোপুরি হাওয়া লেগেছে এখন পালে। তরতর করে ছুটে চললো স্কুনার দিগন্তের জাহাজ লক্ষ্য করে।

আধ ঘন্টা পর। চেনা যাচ্ছে এখন জাহাজটা। আরেকটা স্কুনার। চেহারা, মাস্তুল আর পাল দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সদাগরী জাহাজ।

আমাদের জাহাজটাকে পছন্দ করেনি স্কুনার। নাক ঘুরিয়ে দিলো সেটা। পেছন দেখালো আমাদের। সব কটা পাল তুলে দিয়ে ছুট লাগালো যতো জোরে সম্ভব।

কিন্তু পারবে না আমাদের সঙ্গে, খুব ভালমতোই বুঝলাম। আমাদের স্কুনারটা অনেক বেশি দ্রুতগতি, হালকা। দেখতে দেখতে সদাগরী-জাহাজের আধ মাইলের মধ্যে চলে এলাম। পতাকা তোলার আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন। সদাগরী জাহাজের পাশে গোলা ফেলার নির্দেশ দিলো গোলন্দাজকে।

মুহূর্ত পরেই অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের জাহাজের মাঝা-মাঝি এক জায়গায় দেয়ালের একটা চারকোণা তক্তা সরে গেল। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো পেতলের নল। বিরাট এক কামানের মুখ।

হাঁ হয়ে গিয়েছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। গোলা ভরা হলো কামানে। কান ফাটানো গর্জন উঠলো। বাতাসে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ তুলে ছুটে গেল ভারি গোলা। সদাগরী জাহাজের পেছনে কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়লো। পানিতে পিছলে বলের

মতো ডুপ খেয়ে আবার উঠে পড়লো আকাশে। জাহাজটার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। অনেক দূরে পানিতে গিয়ে পড়লো।

একটা গোলাই যথেষ্ট। যা বোঝার বুঝে গেল সদাগরী জাহাজ। আর পালানোর চেষ্টা করলো না। একে একে নামিয়ে দিলো সব পাল। ভেসে রইলো চুপচাপ।

ওটার একশো গজের মধ্যে চলে এলো আমাদের জাহাজ।

'নৌকা নামাও।' আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন।

দ্রুত নেমে গেল নৌকা। পিস্তল আর কাটলাস নিয়ে নৌকায় নামলো বারো জন নাবিক। আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় বললো ক্যাপ্টেন, 'রালফ, এসো। তোমাকে দরকার হতে পারে আমার।'

অবাক হলাম। কিন্তু নীরবে পালন করলাম তার আদেশ।

মিনিট দশেক পরেই পৌঁছে গেলাম সদাগরী জাহাজে। ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম জাহাজের নাবিকদের। বিকট চেহারা। সব কজন কালো। কারো হাতেই কোনো অস্ত্র নেই। চোখে মুখে ভয়ের ছাপ। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ওদের ক্যাপ্টেন। লম্বা, মাঝবয়েসী। গায়ে শাদা সুতির শার্ট, কোটের পেছনের ঝুল সোয়ালো পাখির লেজের মতো চেরা এবং চোখা। মাথায় শোলার টুপি। হাঁটুর ঠিক নিচেই শেষ হয়ে গেছে আঁটো প্যান্ট।

এক টানে মাথার টুপি খুলে নিলো লোকটা। আমাদের ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে মাথা সামান্য নুইয়ে অভিবাদন জানালো।

'কোথা থেকে আসা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ক্যাপ্টেন।

'কি মাল আছে জাহাজে ?'

'আইটুটাকি থেকে এসেছি,' জবাব এলো। 'যাবো র‍্যারো-টঙ্গায়। আমরা এদেশী মিশনারি। জাহাজের নাম, অলিভ ব্রাঞ্চ। মালপত্র আছে : দু'টন নারকেল, সত্তরটা শুয়োর, বারোটা বেড়াল, আর কিছু বাইবেল।'

হেসে উঠলো আমাদের নাবিকেরা।

ভ্রূকুটি করে তাদের থামিয়ে দিলো ক্যাপ্টেন। 'কেবিনে চলো।' কালো ক্যাপ্টেনকে আদেশ দিলো সে। 'কথা আছে।'

কেবিনে মিনিট পনেরো কাটিয়ে বেরিয়ে এলো দুজনে। হাত মেলালো।

আমাদেরকে নৌকায় নামার আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন।

জাহাজে ফিরে এলাম। আধ ঘণ্টার ভেতরই অনেক পেছনে পড়ে গেল মিশনারিদের স্কুনার।

অনেক রাতে ডেকে উঠে গেলাম সেদিন। হালের চাকা ধরে চুপচাপ বসে আছে বিল। আমাকে দেখেই মুখ তুলে চাইলো।

'একটা কথা বলবে ?' নিচু গলায় বললাম। 'সত্যি কি আমাদেরটা সদাগরী জাহাজ ?'

'হ্যাঁ, এবং না,' সামনের কালো সাগরের দিকে চেয়ে বললো বিল। 'ব্যবসা কিছু করে বটে, তবে বেশি করে ডাকাতি। জোরে যাদের সঙ্গে পারবে না, তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে। আর দুর্বল কাউকে বাগে পেলেই ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয় মালপত্র। কতো রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে দেখেছি এই স্কুনারের ডেকে !'

'তাহলে আজ বিকেলে জাহাজটাকে কেন ছেড়ে দিলো ক্যাপ্টেন?'

'দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলে মিশনারিদের ক্ষতি করে না জলদস্যুরা। তাহলে কোনো দ্বীপেই আর জাহাজ ভেড়াতে পারবে না। না খেয়ে মরতে হবে। এ-অঞ্চলের আদিবাসীরা সব মানুষখেকো, ভয়ংকর হিংস্র। একমাত্র মিশনারিদেরই কিছু বলে না ওরা। কাজেই, যতো বড় ডাকাতই হোক, দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়ে পানি আর খাবার জোগাড় করতে হলে মিশনারিদের সাহায্য লাগবেই। ওদেরকে চটিয়ে দিলে দক্ষিণ সাগরে আর জাহাজ চালাতে হবে না।'

পরদিন সকালে এক গুচ্ছ ছোটো ছোটো দ্বীপপুঞ্জের কাছে পৌঁছে গেল জাহাজ। ওগুলোর মাঝে দিয়ে পথ করে এগিয়ে চললো। ধীর গতি। খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে। কড়া নজর রাখতে হচ্ছে চারপাশে। কখন কোন দ্বীপ থেকে এসে আক্রমণ করে বসে অসভ্য মানুষখেকোরা, কে জানে! তাছাড়া, পানি কোথাও গভীর কোথাও অগভীর। এরই মাঝে মাঝে রয়েছে মারাত্মক প্রবাল প্রাচীর। বেশির ভাগই পানির তলায়। কোনোটাতে ঘষা লাগিয়ে দিলেই দেখতে হবে না আর! সঙ্গে সঙ্গে চিরে কেটে ফালা ফালা করে দেবে জাহাজের তলা।

একদিন, ছোটো একটা দ্বীপের কাছে এসে নোঙর ফেললো জাহাজ। খাবার পানি দরকার। নৌকা নামানোর আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন। দ্বীপ থেকে দুই পিপে পানি নিয়ে আসতে বললো

কয়েকজন নাবিককে। আমিও নামলাম নৌকায়।

তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি, হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একদল জংলী। পানির ধারে এসে সারি দিয়ে দাঁড়ালো। আক্রমণের ভঙ্গিতে নাচাতে লাগলো হাতের বল্লম আর মুগুর।

দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিলাম। পাটাতনে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো মেট। আমরা বন্ধু, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলো।

জবাবে শুরু হলো পাথরবৃষ্টি। কয়েকটা পাথর এসে পড়লো নৌকার ভেতরে। আহতও হলো আমাদের কয়েকজন। তবে বেশির ভাগ পাথরই পড়লো নৌকার আশেপাশে পানিতে।

মেটের আদেশে বন্দুক তুলে নিলাম সবাই। কিন্তু ট্রিগার টানার আগেই জাহাজ থেকে শোনা গেল ক্যাপ্টেনের চিৎকার, 'গুলি কোরো না! নৌকা পিছিয়ে আনো!'

তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে সরে এলাম তীরের কাছ থেকে।

পানির কিনারে এসে ভিড় করেছে এখন শ'পাঁচেক জংলী। চেঁচাচ্ছে, বল্লম আর মুগুর নাচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে।

শ'দুয়েক গজ পিছিয়ে এসেছি, এই সময় কানে এলো কামানের গর্জন। মাথার ওপর দিয়ে শিশ কেটে উড়ে গেল গোলা। পড়লো গিয়ে তীরে দাঁড়ানো জংলীদের উপর। কালো দেহগুলোর মাঝে চওড়া একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে ছুটে চলে গেল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল অসংখ্য কালো দেহ।

আতংকিত চিৎকার উঠলো দাঁড়িয়ে থাকা জংলীদের মাঝে।

শোনা গেল আহতের আর্তনাদ। ঘুরেই ছুট লাগালো, যারা অক্ষত রয়েছে। চোখের পলকে হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে। শাদা সৈকতে পড়ে রইলো কালো মানবদেহের স্তূপ। স্তূপের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম কয়েকজনকে। টলমলো পায়ে এগিয়ে গেল কিছুদূর। কিন্তু বনে ঢোকার আগেই জাহাজ থেকে গর্জে উঠলো বন্দুক। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকগুলো।

শরীরের রক্ত জমে গেল যেন আমার। বিশ্বাস করতে পারছি না নিজের চোখকেও। এ-কি ঘটলো!

পেছনে শোনা গেল ক্যাপ্টেনের চিৎকার, 'এবার যাও তোমরা! পানি নিয়ে এসো!'

আদেশ পালন করলাম। দাঁড় বাইতে লাগলাম নীরবে। সবারই মুখ থমথমে। ওই পাইকারী মানুষ-খুন দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি সবাই।

তীরে ভিড়লো নৌকা। লাফিয়ে নেমে এলাম। সামনেই একটা ছোটো পাহাড়। ঝর্না নেমেছে পাহাড়ের গা থেকে। পিপে নিয়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

কাছে পৌঁছে থ হয়ে গেলাম। পাক দিয়ে উঠলো পেটের ভেতর। রোমহর্ষক দৃশ্য! পানির রঙ লাল।

ঝর্নার ওপরের দিকে বড় ছুটো পাথরে আটকে আছে একটা কালো দেহ। ডান হাত উড়ে গেছে গোলার আঘাতে। ডান পাশে বুকের অনেকখানি গায়েব। আমাদের দিকেই চেয়ে আছে নিষ্প্রাণ ছুটি বড় বড় চোখ। রক্ত মিশে যাচ্ছে পানিতে।

পানি ভরার আগে একবার থমকে দাঁড়ালাম সবাই। ভয়ে ভয়ে তাকালাম এদিক ওদিক। না, কেউ আসছে না। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে জংলীরা।

কেউ বাধা দিতে এলো না আমাদের। একজন নাবিক ঝর্না থেকে লাশটা সরিয়ে ফেললো।

তাড়াতাড়ি পানি ভরে নিয়ে জাহাজে ফিরে এলাম আমরা।

জোর হাওয়া বইছে। পাল তুলে দিতেই ছুটে চললো জাহাজ। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, পালিয়ে যেতে চাইছে যেন ওই ভয়ঙ্কর জায়গা ছেড়ে।

পালিয়ে এলাম বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর ওই খুনের দৃশ্য আঁকা হয়ে গেছে আমার স্মৃতিতে, কোনোদিনই তা মুছবার নয়!

সাতাশ

১

বাতাস আর পড়লো না. বয়ে চললো একনাগাড়ে। তবে গতি সব সময় সমান নয়, কখনো কম, কখনো বেশি।

দিন দুই পরে বিরাট এক দ্বীপের কাছে চলে এলো জাহাজ। আকাশে উঠে গেছে পর্বতের চূড়া। সেদিকে দেখিয়ে, দ্বীপের নাম জিজ্ঞেস করলাম বিলকে।

'ইমো,' জানালো বিল।

'আগে কখনো এসেছিলে নাকি এখানে?' জানতে চাইলাম।

'অনেকবার, এ-জাহাজে করেই। চন্দন কাঠের জন্যে বিখ্যাত। কয়েকবার কাঠ কেটে নিয়ে গেছি এখান থেকে। দ্বীপটা অনেক বড় জনসংখ্যাও অনেক বেশি। ওদের সঙ্গে পারবো না আমরা, তাই বিভিন্ন জিনিসের বিনিময়ে কিনতে হয়েছে গাছ। তবে আগের বার ওদেরকে ঠকিয়েছিলো ক্যাপ্টেন, খারাপ ব্যবহার করেছিলো। এবার ওরা কি করবে, কে জানে! কোনো কিছুকেই ভয় পায় না ক্যাপ্টেন। আমি জানি, দ্বীপে জাহাজ ভেড়াবেই।'

ঠিকই বলেছে বিল। দ্বীপের দিকে নাক ঘুরে গেল স্কুনারের। অসংখ্য প্রবাল প্রাচীরের মাঝে দিয়ে পথ করে এগিয়ে চললো

ধীর গতিতে। ছোটো একটা খাঁড়ির মুখের কাছে এনে নোঙর ফেলা হলো। পানি এখানে ছয় ফ্যাদম। খাঁড়ির তীরে গরান গাছের ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াদানকারী বড় বড় গাছ। ওখান থেকে আধ মাইলটাক দূরে আদিবাসীদের গ্রাম।

নৌকা নামানোর আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নৌকায় নেমে গেল জনা তেরো লোক। নামার আগে আমাকে ডাকলো ক্যাপ্টেন, 'রালফ, তুমিও এসো।' রেলিঙের ধারে দাঁড়ানো মেট-এর দিকে চেয়ে বললো, 'লঙ টমকে তৈরি রাখো। দরকার পড়লেই যেন চালাতে পারো।'

পেতলের কামানটার নাম রেখেছে ক্যাপ্টেন 'লঙ্গ টম'।

ঝপাৎ করে দাঁড় পড়লো পানিতে। স্কুনারের কাছ থেকে তীর গতিতে ছুটে বেরিয়ে এলো নৌকা। কয়েক মিনিটেই খাঁড়ির পাড়ে পৌঁছে গেলাম।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে গেছে পথ। গাঁয়ে এসে ঢুকলাম আমরা। এক পাশে সর্দারের কুঁড়ে। তার নাম, রোমাটা।

আমাদের কুঁড়েতে ঢোকার অনুমতি দিলো সর্দার। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, বাইরে বিরাট উঠনে এসে জমায়েত হয়েছে হাজার দুই জংলী। গায়ের রঙ কালো। প্রায় উলঙ্গ। কোমরের কাছে ঝুলছে এক টুকরো কাপড়, চাইনিজ পেপার-মাল-বেরি গাছের বাকল থেকে তৈরি।

রোমাটার দিকে চোখ ফেরালাম। বিশালদেহী এক কালো

লানব। মুখ ভর্তি দাড়ি। মাথা কামড়ে আছে কোঁকড়া ছোটো ছোটো চুল। পরনে শুধু একটা নেংটি। ঝকঝকে শাদা দাঁত বের করে যখন হাসে, অকারণেই কেঁপে ওঠে বুকের ভেতরটা।

আমাদের সাদরে গ্রহণ করলো রোমাটা। বসতে দিলো মাদুর। প্রথমেই খাবার এলো। ঝলসানো শুয়োরের মাংস, আর বিভিন্ন ধরনের মূল এবং শেকড় সেদ্ধ। ভালোই লাগলো খেতে।

কাজের কথায় এলো এবার ক্যাপ্টেন। আগের বার একটা ভুল হয়ে গিয়েছিলো, বলে, ক্ষমা চাইলো রোমাটার কাছে।

রোমাটা বললো, কবে কি হয়েছে, এতোদিনে ভুলেই গিয়েছে সে। ওসব পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে আর লাভ নেই। আমাদেরকে দেখে খুশি হয়েছে, একথাও জানালো। বনে ঢুকে যতো খুশি চন্দন গাছ কাটার অনুমতি দিয়ে দিলো।

ওদের ভাষা বুঝি না আমি। কথাবার্তা কি কি হলো, বিল ইংরেজিতে বললো আমাকে।

উঠলাম। আমাদেরকে এগিয়ে দিতে এলো রোমাটা। তাকে স্কুনারে আমন্ত্রণ জানালো ক্যাপ্টেন। কি ভেবে রাজি হয়ে গেল সর্দার। দুজন সঙ্গী সহ এলো আমাদের সঙ্গে।

জাহাজে উঠে খুব খুশি রোমাটা। এর আগে আর এতোবড় 'ক্যানো'-তে চড়েনি কখনো, জানালো বার বার। শেষে বললো, পাশের দ্বীপের এক সর্দার বেড়াতে এসেছে ইমোতে। রোমাটার মেহমান। তাকে যদি 'ক্যানোতে' উঠার অনুমতি দেয় ক্যাপ্টেন, খুব খুশি হবে সর্দার।

রাজি হলো ক্যাপ্টেন। তার এক সঙ্গীকে পাঠিয়ে দিলো রোমাটা।

মিনিট দশেক পরেই এসে হাজির হলো পাশের দ্বীপের সর্দার। আকারে রোমাটার প্রায় সমান। চুল দাঁত সবই এক রকম। শুধু চামড়ার রঙে সামান্য তফাৎ রয়েছে। এই লোকটা কয়লার মতো কালো নয়, একটু ধূসর ছোঁয়া রয়েছে। এই রঙ আরো দেখেছি। আভাটিয়ার গায়ের রঙের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

রোমাটার চেয়ে বেশি উৎসাহী লোকটা। জাহাজের আনাচ-কানাচ কোথাও দেখা বাদ দিলো না। অবশেষে তার নজর পড়লো লঙ টমের ওপর। জানতে চাইলো, কি ওটা।

জানানো হলো। কি কাজ করে, তা-ও বলা হলো।

বিশ্বাস করতে চাইলো না লোকটা। রোমাটাও সন্দেহ প্রকাশ করলো কামানের কার্যকারিতা সম্পর্কে।

সুতরাং দেখাতেই হলো। তবে এতে মনে মনে খুশি হলো ক্যাপ্টেন। আমাদের ক্ষমতা দেখিয়ে দেয়া গেল জংলীদেরকে। একটু বেশি সমীহ করে চলবে ওরা এরপর থেকে, ক্যাপ্টেনের তাই ধারণা।

ডঙ্গা সরে গিয়ে বেরিয়ে এলো কামানের মুখ। মাইল দুয়েক দূরে সাগরের বুকে মাথা উঁচু করে রাখা ছোটো একটা পাহাড় দেখালো ক্যাপ্টেন। দুই সর্দারকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে বললো।

গর্জে উঠলো কামান। গোলা গিয়ে পড়লো পাহাড়ের মাথায়।

ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে নিয়ে চলে গেল পানির তলায়।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে দুই সর্দারের। বিশ্বাস করতে পারছে না যেন নিজের চোখকে।

পরদিন সকালেই বনে চললাম চন্দন কাঠ কাটতে। জাহাজে মাত্র দুজন নাবিককে নিয়ে রয়ে গেছে ক্যাপ্টেন, বাকি সবাই চলে এসেছি আমরা। কামানটা মুখ করে রেখেছে রোমাটার কুঁড়ের দিকে। ক্যাপ্টেনের বাড়তি সাবধানতা।

আমার সঙ্গীরা সবাই বন্দুক পিস্তল সঙ্গে রেখেছে। কাটলাসও আছে প্রত্যেকের কোমরে। হাতে কুড়াল।

এক সারিতে এগিয়ে চলল ম। চিরসবুজ বনের অদ্ভুত সুগন্ধ বাতাসে। ঘন হয়ে জন্মেছে কলা, নারকেল, রুটি ফল আর অন্যান্য গাছপালা। কুল গাছ দেখলাম অনেক। ওগুলোর মাঝে মাঝেই রয়েছে বড় বড় অশ্বত্থ। বেশির ভাগ গাছই এখন আমার চেনা. প্রবাল দ্বীপে দেখেছি। প্রচুর পরিমাণে জন্মে আছে ট্যারো, গোল আলু, মিষ্টি আলু। ক্ষেতের আশপাশ আর মাঝের আগাছা সাফ করে বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ করেই বেরিয়ে এলাম ছোট্ট একটা খোলা জায়গায়। ওখানে জংলীদের কুঁড়ে। বাঁশের বেড়া আর খুঁটি, চাল ছাওয়া হয়েছে পুরু বিশাল আকারের প্যাণ্ডানাস পাতা দিয়ে। কুঁড়ের বাইরে বসে আছে নারী-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা। সবাই অবাক চোখে দেখছে আমাদেরকে। কুঁড়েগুলো পেরিয়ে এলাম। দল বেঁধে

ছেলেমেয়েরা পিছু নিয়েছে। কয়েকজন যুবক আর বুড়োও রয়েছে ওদের সঙ্গে।

দ্বীপের আধ মাইল ভেতরে এসে চন্দন গাছের দেখা পাওয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল আমার সাথীরা। আমি চললাম কাছের পাহাড়টার দিকে। ওটার মাথায় চড়ে দ্বীপ আর তার আশপাশ দেখার ইচ্ছে।

দুপুরের দিকে খাবার পাঠিয়ে দিলো রোমাটা। শুয়োরের ঝল-সানো মাংস আর বিভিন্ন ধরনের শেকড় সেদ্ধ। বনে ফলমূল আছে প্রচুর, ওগুলো পেড়ে নিয়েই খাওয়া যায়।

আমার খাবার নিয়ে খুঁজতে এলো বিল।

খেতে খেতে কথা বলতে লাগলাম। একটা ব্যাপার অনেক দিন থেকেই ভাবছি, দক্ষিণ সাগরের যেখানে যে দ্বীপেই নেমেছি, সাপ চোখে পড়েনি। একটা ছোটো আকারের গিরগিটির ওপর চোখ পড়তেই আবার মনে পড়ে গেল কথাটা।

'আচ্ছা, বিল,' বলে ফেললাম, 'এদিকে সাপ-টাপ নেই নাকি?'

'না,' জানালো বিল, 'ছোটো গিরগিটি আছে কয়েক ধরনের, তা-ও বিষাক্ত না। সাপ নেই, তবে পানিতে ভয়াবহ এক ধরনের সরীসৃপ আছে।'

'কুমির?'

'না,' বললো বিল। 'এসো, দেখাচ্ছি।'

বনের ধারে ছোটো এক পুকুরের পাড়ে নিয়ে এলো আমাকে

বিল। আসার পথে সঙ্গে ডেকে এনেছে আট-নয় বছরের একটা ছেলেকে।

ছেলেটাকে কি বললো বিল, বুঝতে পারলাম না।

পানির ধারে গিয়ে দাঁড়ালো ছেলেটা। হঠাৎ তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠলো।

মুহূর্ত পরেই তোলপাড় উঠলো পানিতে। হুঁসস করে পানিতে মাথা তুললো এক দানব। বিশাল এক বান মাছ। বিকট মুখে ক্ষুরের মতো ধারালো দাঁত। কাছে চলে এলো ওটা। তীরের নরম মাটিতে মাথা রেখে ভেসে রইলো। অনুমান করলাম, বারো ফুটের কম হবে না। মানুষের উরুর সমান মোটা। মাথা চুলকাতে দিলো ছেলেটাকে ভয়াবহ বান। যারা একে দেখেনি, কিংবা এর চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নয়, তারা কল্পনাই করতে পারবে না, পানির তলায় কতোখানি ভয়ংকর ওই প্রাণী।

'ওই যে, ব্যাটা!' মুখ বিকৃত করলো বিল। 'ওটাকে দেবতা ভাবতে কেমন লাগবে, রালফ?...সত্যিই তাই, বিচ্ছিরি ওই জীবটা কালোদের দেবতা! ইতিমধ্যেই বেশ কিছু শিশুকে হজম করেছে। আরো কতো শিশু খাবে, কে জানে!'

'শিশু!' তাজ্জব হয়ে বিলের মুখের দিকে তাকালাম।

'মানব শিশু;' বললো বিল। 'হয়তো বলবে: অসম্ভব, এ-হতে পারে না! কিন্তু হয়েছে। নিজের চোখে দেখেছি। জ্যান্ত শিশুকে ফেলে দেয়া হয়েছে ওটার সামনে। আরামসে এখানেই বসে বসে খেয়েছে ব্যাটা!' নাকমুখ কুঁচকে জীবটার দিকে তাকালো সে।

উপচে পড়ছে ঘৃণা। হাতের ইশারায় ছেলেটাকে চলে যেতে বললো। তারপর হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ধাঁ করে এক লাথি বসিয়ে দিলো বানের নাকেমুখে।

মানুষের কাছে জীবনে এ-ধরনের ব্যবহার পায়নি বানটা। প্রথমে বোধহয় একটু চমকেই গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পিছলে সরে গেল ডাঙার ওপর থেকে। পানিতে ওলট-পালট করতে লাগলো বাথায়। শক্ত বুটের লাথিতে ওটার ভোঁতা নাক থেঁতলে দিয়েছে বিল।

'ছেলেটা দেখেনি,' পেছনে চেয়ে বললো বিল। 'দেবতাকে লাথি মেরেছি দেখলে সহ্য করতো না কিছুতেই। বড়দের ডেকে নিয়ে আসতো। আমাকেই কেটে টুকরো টুকরো করে খাওয়াতো ওই মাছটাকে দিয়ে।'

'শিশু দিতে আপত্তি করে না মায়েরা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কি যে বলো! আপত্তি করবে! ওরাই তো এনে দেয়। নিজের হাতে নিজের সন্তানকে বানের মুখে ছুঁড়ে দেয় মা। দেবতার পূজারীরা দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে নিজের জীবন দিয়ে দেয়, সন্তান তো কিছুই না। এখানে একটা সম্প্রদায় আছে, ওরা সব চেয়ে সম্মানিত এ-দ্বীপে। "আরেওই" বলে ওদেরকে। তাদের কারো বাচ্চা হলেই মেরে ফেলে। মা সন্তানকে তুলে দেয় বাপের হাতে। চোখা কঞ্চিতে গেঁথে, গলা টিপে, কিংবা মাটির তলায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলে নবজাতককে। আর বান দেবতার হাতে তুলে দেয়াটাকে তো রীতিমতো সৌভাগ্য মনে করে।'

শিউরে উঠলাম। মোচড় দিয়ে উঠলো পাকস্থলী। হঠাৎই অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

'কি হলো?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো বিল।

'কিছু না, চলো ফিরে যাই।'

'শুধু তাই না।...' হাঁটতে হাঁটতে বললো বিল।

'না না, আর দরকার নেই!' থামিয়ে দিলাম তাকে। 'আর শুনতে চাই না! এরা মানুষ না, জানোয়ারেরও অধম!'

আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো বিল। চুপ হয়ে গেল।

আটাশ

হপ্তাখানেক পেরিয়ে গেল।

চন্দনকাঠ কাটা চলছে একনাগাড়ে। স্তূপ হয়ে গেছে বনের ভেতরে। বেঁধেছেদে এনে জাহাজে তোলার সময় হয়েছে।

রোজই দলের সঙ্গে যাই আমি। গাছ কাটা বাদ দিয়ে ঘুরে বেড়াই জঙ্গলে, গাঁয়ের ভেতরে। অদ্ভুত কিছু না কিছু রোজই দেখছি। রীতিমতো ঘৃণা জন্মে গেছে দ্বীপটার ওপর। এমন অবস্থা হয়েছে এখন, পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

রোমাটার সঙ্গে গোলমাল বাধিয়ে বসেছে ক্যাপ্টেন। বুঝতে পারছি, সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারে যে কোনো সময়। সবাই উপলব্ধি করতে পারছি আমরা ব্যাপারটা।

বিশাল কামানের ভয়েই এখনো চুপ করে আছে রোমাটা। তবে কতোদিন সে ভীতি থাকবে, বলা যায় না।, যে কোনো সময় আমাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারার আদেশ দিয়ে বসতে পারে সে।

আট দিনের দিন, সকালে, খুব খারাপ অবস্থায় ঘুম ভাঙলো আমার। জ্বর জ্বর লাগছে। মন ভীষণ খারাপ।

নাস্তা শেষ হলো। ডেকের ওপর জমায়েত হয়েছে নাবিকরা। কাঠ কাটতে যেতে প্রস্তুত।

আমি থেকে যেতে চাইলাম জাহাজে। শরীর খারাপ। কিন্তু কোনো কথাই শুনলো না ক্যাপ্টেন। তীরে পাঠাবেই আমাকে। নাবিকেরা সবাই আমাকে পছন্দ করে, তাই আমি কাজ করি না, একথাটা এখনো কেউ লাগায়নি ক্যাপ্টেনের কাছে।

যেতে বলেও আমার চেহারা দেখে কি ভাবলো ক্যাপ্টেন, কে জানে। বললো, 'ঠিক আছে, গাছ কাটতে যেও না। তবে, বিশেষ একটা কাজ নিয়ে গাঁয়ে যেতে হবে। রোমাটার জন্যে কিছু উপহার নিয়ে যাবে। ভজিয়ে-ভাজিয়ে নরম করে আসতে হবে তাকে। না না, একা যেতে হবে না, বিল যাবে সঙ্গে। কথাবার্তা সব সে-ই বলবে।'

'ঠিক আছে,' বললাম।

উপহার দেখে আমি হেসেই খুন। তিমির কয়েকটা দাঁত। এক মাথায় লাল রঙ করা। এ-জিনিস নাকি জংলীদের কাছে খুব প্রিয়, মহামূল্যবান।

রোমাটার কুঁড়ের সামনে দাঁড়ালাম। ভেতরে খবর পাঠাতেই ঢোকার অনুমতি এলো।

মাদুরের ওপর মাথা উঁচু করে রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে নেংটিপরা রোমাটা। কড়া চোখে তাকালো আমাদের দিকে। কিছু বললো বিল। নরম হয়ে এলো সর্দার। আমার হাতের দিকে তাকালো। ইঙ্গিতে উপহার দেখাতে বললো।

রঙিন কাপড়ে পেঁচানো তিমির দাঁতগুলো বের করে রাখলাম তার সামনে।

চকচক করে উঠলো রোমাটার চোখ। কিন্তু ভারিক্কি ভাবটা বজায় রাখলো। তুচ্ছ কিছু জিনিস যেন, এমনি ভঙ্গিতে হাত দিয়ে ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখলো দাঁতগুলো।

'যাও,' হাত নেড়ে বললো রোমাটা, 'ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলো, আজ গাছ কাটতে পারবে। তবে কাল বনে ঢুকতে দেবো কি দেবো না, জানি না এখনো...'

বেরিয়ে এলাম কুঁড়ে থেকে। বুনোপথে চলতে চলতে এক সময় মাথা নাড়লো বিল। 'অঘটন ঘনিয়ে আসছে! জানোয়ারটার কালো মাথায় শয়তানী বুদ্ধি ঢুকেছে! আর তাকেই বা দোষ দেবো কি? ক্যাপ্টেন...' একটা শোরগোল কানে আসতেই থেমে গেল সে।

বনের ভেতর থেকে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে এলো একদল স্রংলী। কাঁধে করে বয়ে আনছে গাছের কাটা কাণ্ড।...না না, ভুল বলেছি! বাঁশে বাঁধা মানুষ, জ্যান্ত! বোধ হয় পাশের কোনো দ্বীপে গিয়ে লড়াই করে জিতেছে, ধরে নিয়ে এসেছে বন্দিদের। পাশ দিয়ে যাবার সময় গুণলাম, বিশজন।

'আবার খুনখারাপি!' অদ্ভুত এক আওয়াজ বেরোলো বিলের গলা থেকে। চাপা করুণ হাসি আর গোঙানির মিশ্র একটা শব্দ।

'বন্দিদেরকে খুন করবে!' অযথাই বললাম। গত কয়েক দিনে ভালো করেই জেনেছি, কতোখানি হিংস্র দক্ষিণ সাগরীয় আদি-

বাসীরা।

'চলো, নিজের চোখেই দেখবে,' বললো বিল।

মন সায় দিলো না প্রথমে। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহলের কাছে শেষ অবধি হার মানতেই হলো। এগোলাম বিলের সঙ্গে।

বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। অনেকখানি এগিয়ে গেছে জংলীরা। চেঁচামেচি কানে আসছে, কিন্তু গাছপালার জন্যে দেখা যাচ্ছে না ওদের।

হঠাৎ থেমে গেল চেঁচামেচি। চারপাশে অদ্ভুত এক নীরবতা। আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান লাগালো বিল। 'জলদি এসো!'

হঠাৎ শেষ হয়ে গেল বন। একটা খাঁড়ির পাড়ে বেরিয়ে এলাম। তীরে দাঁড়িয়ে লাফালাফি, হৈ চৈ করছে অসংখ্য জংলী। সবারই চোখ পানির দিকে।

হাতের ধাক্কায় কয়েকজনকে পাশে সরিয়ে দিয়ে পথ করে নিলো বিল, আমাকে নিয়ে এসে দাঁড়ালো পাড়ে। সব কজন বন্দিকে পানিতে ফেলা হয়েছে। লম্বা বাঁশের দুদিক থেকে ধরে আছে দুজন করে জংলী, বন্দিদের মুখ, পেট আকাশের দিকে করে রেখেছে। তীর ঘেঁষে ভেসে আছে বড় একটা যুদ্ধক্যানো। দাঁড় হাতে উঠে বসেছে তাতে সোদ্ধারা।

হঠাৎ চিৎকার করে আদেশ দিলো তীরে দাঁড়ানো এক ছোটো সর্দার। ঝপাৎ করে একই সঙ্গে সবগুলো দাঁড় পড়লো পানিতে। নড়ে উঠলো ভারি ক্যানো। গতি বাড়লো। হঠাৎ তীব্র গতিতে ছুটতে শুরু করলো। কি হবে, তখনো বুঝতে পারিনি!

একের পর এক সারি দিয়ে ভাসিয়ে রাখা হয়েছে বন্দিদেরকে। আর্তনাদ করে উঠলো সারির প্রথম লোকটা। ক্যানোর জন্যে দেখতে পাচ্ছি না এখনো। তার চিৎকার মিলাতে না মিলাতেই শোনা গেল আরেকটা চিৎকার, তারপর আরেকটা। তীরে দাঁড়ানো জংলী আর যোদ্ধাদের উল্লসিত চেঁচামেচিতে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হলো।

এগিয়ে গেল ক্যানোটা। এইবার দেখতে পেলাম, বীভৎস দৃশ্যটা! অসহায় বন্দিদের কারো কপাল চৌচির হয়ে গেছে ক্যানোর চোখা মাথার খোঁচায়, চোখ গলে বেরিয়ে এসে ঝুলছে গালের ওপর, কারো থুতনির নিচের অংশ থেকে শুরু করে চিবুক, দাঁতের পাটি, জিব, নাক, কপাল সব ছিঁড়ে চলে গেছে! রক্তে লাল হয়ে গেছে পানি। ছটফট করছে এখনো হতভাগা লোক-গুলো। মরবে, তবে অনেক যন্ত্রণা পেয়ে, অনেক সময় নিয়ে। (পাঠক, হয়তো ভাবছেন, ভয়াল-রোমাঞ্চকর এক কাহিনী ফেঁদে বসেছি! কিন্তু বিশ্বাস করুন, যা লিখেছি, এর এক বিন্দু মিথ্যে নয়। বাস্তব সত্যি! নিজের চোখে দেখেছি আমি ওই পৈশাচিক দৃশ্য—লেখক।) আর চেয়ে থাকতে পারলাম না। বোঁ করে ঘুরে উঠলো মাথা। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম ঘাসের ওপর...

হুঁশ ফিরলে দেখলাম, বিলের কোলে রয়েছি। দু'হাতে বাচ্চা শিশুর মতো তুলে নিয়েছে আমাকে সে। চোখে রাজ্যের উৎ-কণ্ঠা। আমি চোখ মেলতেই হাসলো, বিষণ্ণ হাসি। 'চলো, আর এক মুহূর্ত এখানে না...'

বনের ভেতর এসে আমাকে নামিয়ে দিলো বিল। কি করে যে জাহাজে ফিরলাম, বলতে পারবো না।

এরপর, সারাটা বিকেল যেন একটা ঘোরের মাঝে কাটলো। কেবিনের ধারে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে চেয়ে আছি। এই সময় কানে এলো ফিসফাস কথা। কেবিন থেকে। নিচু গলায় কথা বলছে ক্যাপ্টেন আর ফার্স্ট মেট। কৌতূহল হলো। গিয়ে কান পাতলাম কেবিনের বন্ধ দরজার গায়ে।

'মোটেই ভাল লাগছে না আমার ব্যাপারটা,' বললো মেট।

'লড়াইই করবো শুধু। বিনিময়ে কিচ্ছু পাবো না!'

'কেন? পাবে না কেন?' রেগে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে। 'এতগুলো চন্দন কাঠ!...এটা কি কম কথা নাকি!'

'কম কথা না,' স্বীকার করলো মেট। 'তবে ওগুলো তো পড়ে আছে জঙ্গলে। খামোকা কেন শুধু শুধু লড়াই বাধাবেন? কালোরা যা চায়, দিয়ে দিলেই তো হলো। এতে এমন আর কি খরচ হবে?'

'মেট,' ভারি গলায় বললো ক্যাপ্টেন, 'নৌকার মাঝির মতো কথা বলছো তুমি। আমার জাহাজে মেয়েমানুষ চাই না। থাকতে হলে, পুরুষের মতো থাকতে হবে।'

'বেশ, পুরুষের মতোই থাকবো,' কেমন যেন অনিশ্চিত শোনালো মেটের গলা। 'ক্যাপ্টেন, কি করতে চান এখন?'

'দাঁড় বেয়ে বনের ধারের খাঁড়িতে নিয়ে যাবো স্কুনারটা। জাহাজে দুজন লোক রেখে, সবাইকে নিয়ে তীরে চলে যাবো। বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কালো পাহারাদারদের তাড়াবো বন থেকে। আমরাই বয়ে নিয়ে আসবো কাঠগুলো। তবে কাজটা করবো রাতের বেলা। আজ অনেকগুলো বন্দিকে ধরে এনেছে ওরা। রাতে ভোজ হবে। দেবতার মন্দিরের সামনে ব্যস্ত থাকবে গাঁয়ের লোক। সেই সুযোগে কাজ সেরে ফেলবো আমরা।'

'বেশ, তাই হবে। সবাইকে সেরকমই বলে রাখি আমি।'

'শোনো, বলার আগে এক গ্লাস করে রাম খাইয়ে নিও···'

এক লাফে সরে এলাম দরজার কাছ থেকে। আবার গিয়ে দাঁড়ালাম রেলিঙের ধারে। আমার দিকে তাকালো না মেট। মুখে চিন্তার ছাপ। সোজা নেমে চলে গেল নিচে।

বিলের কাছে গিয়ে সব কথা জানালাম তাকে। শুনে সে-ও চিন্তিত হয়ে পড়লো। বললো, 'কাজটা ভালো করছে না ক্যাপ্টেন!'

সাঁঝের পর পরই শেষ হয়ে গেল রাতের খাওয়া। জাহাজে টান টান উত্তেজনা। সবাই তৈরি। রাত বাড়ার অপেক্ষায় আছি।

মাঝরাতে, জাহাজের নোঙর তোলার আদেশ দিলো ক্যাপ্টেন।

দাঁড় বাওয়া শুরু হলো। বিশাল একেক দাঁড়। ভারি।

একেকটার জন্যে দুজন লোক লাগছে।

কয়েক মিনিট পরেই ছোটো এক নদীর মুখে চলে এলো জাহাজ। আরো আধ ঘণ্টা পর পৌঁছে গেল বনের ধারে খাঁড়িতে। তীর থেকে ছয়শো গজ দূরে জাহাজ রাখার নির্দেশ দিলো ক্যাপ্টেন।

উজান বেয়ে এসেছি আমরা। যাবার সময় বেশি কষ্ট করতে হবে না। স্রোতই ঠেলে সাগরে বের করে নিয়ে যাবে জাহাজকে। আর পালে যদি সামান্য হাওয়া লাগানো যায়, তাহলে তো উড়ে চলে যাবে।

অন্ধকার। গরান গাছের জঙ্গল যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে যেন ঘন কালো কালি ঢেলে দেয়া হয়েছে। নৌকা নামানো হলো নিঃশব্দে। দূরে গাঁয়ে শোনা যাচ্ছে জংলীদের হট্টগোল। এদিকে একটা কালোও পাহারায় আছে বলে মনে হয় না।

'জাহাজে কাউকে রেখে যাবার দরকার নেই,' হঠাৎ বললো ক্যাপ্টেন। 'দুজন লোক দুটো বোঝা নিয়ে আসতে পারবে। কালোরা কেউ নেই এদিকে। জাহাজ পাহারা দেয়া লাগবে না।'

তীরে ভিড়লো নৌকা। একে একে নেমে গেল নাবিকেরা। আমাকে বোটে থাকতে বললো ক্যাপ্টেন। চোখ কান সজাগ রাখতে বললো। কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই শিস দিতে হবে।

বসে রইলাম ঘন কালো অন্ধকারের দিকে চেয়ে। বনে

ঢুকে গেছে আমাদের সবাই, বেশ কয়েক মিনিট আগে। কোন-রকম সাড়াশব্দ নেই কোনোদিকে। অজানা আশংকায় দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। ওপরে তাকালাম। তারা জ্বলছে। দু-একটা মিটমিট করে চোখ টিপছে যেন আমার দিকে চেয়ে।

হঠাৎ এমন চমকে উঠলাম, নৌকার কিনারে বসা থাকলে পানিতেই পড়ে যেতাম। নিঝুম নীরবতাকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে গর্জে উঠেছে বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল হাজারো কালো কণ্ঠের চিৎকার। গাঁয়ের দিক থেকেও ভেসে এলো মিলিত চিৎকার। তারপরই শোনা গেল ছুটোপুটি, বনের ভেতর ছোটাছুটি করছে লোকজন।

শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি, আহতের আর্তনাদ।

হঠাৎ শোনা গেল আমাদের লোকের চিৎকার, তারপরই আর্তনাদ। আরেকবার, তারপর আরেকবার। বুঝতে অসুবিধে হলো না, কি ঘটেছে। কালোদের হাতে ধরা পড়তে চাইলাম না কিছুতেই। দুপুরে কি করে বন্দিদের মেরেছে, দেখেছি। দৃশ্যটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। হাত-পা হিম হয়ে এলো। কি করবো এখন? বনে ঢুকে সোজা পাহাড়ের দিকে ছুট লাগাবো? না, তাহলে বাঁচতে পারবো না। জাহাজে ফিরে যাবো? কিন্তু একা ওই স্কুনার বেয়ে নিয়ে যাবো কি করে?

শেষে জাহাজে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম। আমাকে চমকে দিয়ে কাছেই শোনা গেল একটা চিৎকার। গলাটা

চিনি। ফার্স্ট মেট। তার পর পরই চেঁচিয়ে উঠলো কয়েকটা কালো। মেটের কপালে কি ঘটেছে, বুঝে ফেললাম। আর ভাবনা-চিন্তার সময় নেই। জাহাজেই ফিরে যেতে হবে। তার-পর কি করা যায়, পরে দেখা যাবে।

বনের প্রান্তে আবার শোনা গেল আর্তনাদ, তারপর আবার। সব আমাদের লোকের। চেঁচামেচি করছে কমপক্ষে শ'খানেক জংলী।

লাফিয়ে তীরে নামলাম। নৌকার বাঁধন খুলে দিয়ে গলুই ধরে ঠেলে ভাসাতে যাবো, হঠাৎ ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে বেরিয়ে এলো একজন মানুষ। আঁতকে উঠে পেছন ফিরে চাইলাম। 'কে?'

'রালফ, আমি!' বিলের গলা। 'নৌকা ভাসাও! জলদি!'

ধাক্কা দিয়ে নৌকা ভাসিয়েই লাফিয়ে উঠে বসলাম। আমার পর পরই লাফিয়ে এসে উঠলো বিল। আরেকটু হলে কাত করে ডুবিয়েই দিয়েছিলো নৌকা।

'জলদি! জলদি দাঁড় ধরো!'

কয়েক সেকেণ্ডেই চলে এলাম জাহাজের গায়ে। উঠে পড়-লাম ডেকে। নোঙর তোলার সময় নেই। কুড়ালের এক কোপে দড়ি কেটে দিলাম। আমাকে হাল ধরতে বলে বিশাল এক দাঁড় তুলে নিলো বিল। আসার সময় দাঁড় বাওয়ায় যোগ দেয়নি সে। কি সাংঘাতিক জোর তার গায়ে! একাই দাঁড় বেয়ে জাহাজটাকে নদীর মাঝামাঝি নিয়ে এলো।

স্রোতের টানে এগিয়ে চললো জাহাজ। পালে বাতাস লাগছে না। দাঁড় বাইতে লাগলো বিল। বেশ জোরেই ছুটলো স্কুনার।

প্রথম দিন যে খাঁড়ির মুখে নোঙর করেছিলাম, দেখতে দেখতে তার কাছে চলে এলো জাহাজ। যাক, বেরিয়ে যেতে পারবো।...কিন্তু পরক্ষণেই হাজারো কণ্ঠে চিৎকার উঠলো। খাঁড়ির পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে কালোরা। জাহাজটা দেখে ফেলেছে। ঝপাঝপ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ওরা। সাঁতরে এগোলো খাঁড়ির মুখের দিকে।

গতি বাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে বিল। কিন্তু এতো-বড় একটা জাহাজকে নিয়ে একা সে কি করতে পারে? খাঁড়ির মুখে চলে এলো স্কুনার। পেরিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে নোঙ-রের ঝুলে থাকা কাটা দড়িটা ধরে ফেললো এক জংলী। উঠে আসতে লাগলো দড়ি বেয়ে। দাঁতে কামড়ে রেখেছে ইয়া বড় এক ছুরি।

দাঁড় ছেড়ে দিয়ে একলাফে উঠে এলো বিল। জংলীটা উঠে পড়েছে। রেলিঙ টপকে ডেকে পড়ার আগেই তার মুখে ভয়ানক এক ঘুসি বসিয়ে দিলো। উড়ে গিয়ে পানিতে পড়লো কালোটা।

ইতিমধ্যে জাহাজের চারপাশে ঝুলে থাকা দড়ি, কাঠের দণ্ড, যে যা পেয়েছে ধরে ফেলেছে জংলীরা। বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে একের পর এক। হালের চাকা ছেড়ে দিয়ে একটা

কুড়াল তুলে নিলাম হাতে। জান বাঁচানো ফরজ।

একের পর এক গুলি করে চলেছে বিল। আমি লাগাচ্ছি কুড়ালের কোপ। দেখতে দেখতে উঠে আসা সব কটা জংলী-কে পানিতে ফেলে দিলাম। একটাও রেলিং টপকাতে পারলো না।

কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। পঙ্গপালের মতো ঝাঁক বেঁধে আসছে জংলীরা। কয়েকটা যুদ্ধ ক্যানো ভাসানো হয়ে গেছে। যে হারে ভেসে চলেছে জাহাজ, পারা যাবে না ওদের সঙ্গে। শিগগিরই ধরে ফেলবে।

ছুটে চলে গেল বিল কামানের কাছে। আর কোনো উপায় নেই। কয়েক সেকেণ্ড পরেই কান ফাটানো গর্জন করে উঠলো কামান। ক্যানোগুলোর মাঝে পানিতে পড়লো গিয়ে গোলা। পানি ছিটকে উঠলো আকাশে। উল্টে গেল সব কয়টা ক্যানো। তবে মানুষের কোনো ক্ষতি করেনি ক্যানোটা।

আবার গোলা ফেললো বিল। এবার বনের ধারে, কালোরা যেখানে ভিড় করে আছে আর কয়েক গজ সামনে, পানিতে। কাদাপানি ছিটকে উঠলো আকাশে। এবারেও জংলীদের কোনো ক্ষতি হলো না।

তবে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। আর এগিয়ে আসার সাহস করলো না যারা পানিতে নেমেছিলো। ঘুরেই দৌড় লাগালো তীরে দাঁড়িয়ে থাকা জংলীরা। চোখের পলকে হারিয়ে গেল বনের ভেতর।

হঠাৎ জোর ঝাঁকুনি খেলো জাহাজ। না, ভাবনার কিছু নেই। বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে এসেছে। মনের জন্যে হাওয়া লাগেনি, খোলা জায়গায় বেরোতেই পালে ধাক্কা দিয়েছে বাতাস।

দেখতে দেখতে খোলা সাগরে বেরিয়ে এলো জাহাজ।

উনত্রিশ

বিপদ সীমা পেরিয়ে এসেছি। হঠাৎই ভীষণ ক্লান্তি এসে চেপে ধরলো।

হালের চাকা ধরেছে বিল। ডেকে দাঁড়িয়ে আছি আমি। পেছনে কালো আকাশের পটভূমিতে মৃত্যু দ্বীপের কালো ছায়া। সাগরের কুরকুরে শীতল হাওয়া এসে লাগছে গালে, মুখে। শুয়ে পড়লাম ডেকের ওপরই।

মুখে রোদ পড়তেই চোখ মেললাম। উঠে এগিয়ে গেলাম রেলিঙের ধারে।

শান্ত সাগর। চমৎকার হাওয়া। তরতর করে এগোচ্ছে স্কুনার। ডেকে শুয়ে আছে বিল। একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে হালের চাকা। আমার সাড়া পেয়ে চোখ মেললো।

বিলের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। বসলাম তার পাশে।

এ-কি চেহারা হয়েছে! ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য। পিঠের কাছে ডেকে রক্ত, চুলে রক্ত, রক্তে লাল শার্ট। বুকের কাছে গোল একটা ছিদ্র, ছেঁড়া কাপড়ে কাদার ছোপ।

'বিল!' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তুমি আহত!'

মলিন হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকালো। 'হ্যাঁ। বুকে গুলি খেয়েছি। তোমার জাগার অপেক্ষা করছিলাম। একটু ব্র্যাণ্ডি দেবে?'

ছুটে নিচে চলে গেলাম। ভাঁড়ার থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল আর কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে ফিরে এলাম।

বিস্কুট চিবিয়ে ব্র্যাণ্ডি দিয়ে গিলে খাওয়ার পর একটু সুস্থ দেখালো বিলকে। বোতলটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো।

নিচে গিয়ে নাস্তা সেরে নিলাম আমি। বিলের জাগার অপেক্ষায় রইলাম।

শিগগিরই জেগে উঠলো বিল। আমার দিকে চেয়ে হাসলো। 'রালফ, এখন অনেকটা ভালো লাগছে।'

উঠে বসার চেষ্টা করলো বিল। কিন্তু চাপা গলায় গুঙিয়ে উঠেই শুয়ে পড়লো আবার।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো,' ওর পাশে বসে বললাম। 'তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসছি। তারপর তোমার ক্ষত দেখবো।'

রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ডিম ভাজলাম কয়েকটা। কফি বানিয়ে ট্রে-তে করে নিয়ে এলাম।

ডিম দিয়ে রুটি খেয়ে পর পর দু'কাপ কফি গিললো বিল। শার্ট খুলতে তাকে সাহায্য করলাম।

পিস্তলের গুলি। বুকের একপাশ দিয়ে ঢুকেছে। বেরোনোর

ফুটো নেই, তারমানে ভেতরেই রয়ে গেছে গুলি। নড়াচড়ায় ক্ষত থেকে বেরিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো আবার কালচে-রক্ত।

সেদিকে একবার চেয়ে মাথা নাড়ালো বিল। 'রালফ, বসো ওখানে। কি করে গুলি খেলাম, বলছি। কালোদের বোকা বানাতে পারেনি ক্যাপ্টেন। আগে থেকেই এমন কিছু একটা ভেবে রেখেছিলো রোমাটা। ক্যাপ্টেনের ফন্দি টের পেয়ে গিয়েছে আগে থেকেই। আস্ত একটা কালো শয়তান! বনের ভেতরে তার লোক পাহারায় রেখে দিয়েছিলো। সোজা গিয়ে বাঘের মুখে পড়লাম আমরা। আমি ছিলাম ক্যাপ্টেনের পাশে। কালোরা আক্রমণ করতেই ক্ষেপে গেল ক্যাপ্টেন। ধরেই নিলো, আমি আগেভাগে জংলীদের জানিয়ে দিয়েছি সব। বেঈমান, কুত্তা বলে গাল দিয়েই গুলি চালালো আমার ওপর। থাবা মেরে ওর হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিয়েই সরে এলাম। ঠিক ওই মুহূর্তে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকটা জংলী। একজন বল্লম ঢুকিয়ে দিলো ক্যাপ্টেনের বুকে। আরেকজন মুগুর দিয়ে বাড়ি লাগালো মাথায়। আর দেখার অপেক্ষা করলাম না। নৌকার দিকে ছুটলাম।'

থামলো বিল। একনাগাড়ে এতোগুলো কথা বলে হাঁপাচ্ছে। মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ।

'বিল,' বললাম, 'কি করবো এখন আমরা? বাতাস বাড়ছে। কোন দিকে চালাবো জাহাজ?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালো বিল। 'যেদিকে খুশি চালাও। কোনো কিছুতেই আর কিছু যায় আসে না আমার। সময় ফুরিয়ে এসেছে!'

'প্রবাল দ্বীপে যেতে চাই আমি, বিল। পথ চিনিয়ে দিতে পারবে?'

আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলো বিল। 'চার্টটা নিয়ে এসো।'

ছুটে গিয়ে কেবিন থেকে নিয়ে এলাম চার্ট। একটা ছোটো বিন্দুর ওপর আঙুল রাখলো বিল। এটা প্রবাল দ্বীপ। এপথে যেতে হবে। জাহাজ চালাতে জানো তো?'

'জানি। তবে একা কতোখানি সামলাতে পারবো, কে জানে! তুমি যদি রোজ ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে হাল ধরতে পারো, আমি ঘুমিয়ে নিতে পারবো। বাকি সময়টা একাই পারবো আশা করছি।'

মাথা ঝোঁকালো বিল। 'পারবো।'

হালের চাকা ধরলাম।

'রালফ,' হঠাৎ বললো বিল। 'তোমার বয়সেই আমাকে কিডন্যাপ করে এনে জাহাজে তুলেছিলো ক্যাপ্টেন। তারপর থেকেই আছি এখানে, বাধ্য হয়ে। জলদস্যু হয়েছি। আমাকে ...আমাকে তুমি ঘৃণা করো না তো?'

চোখ ফেরালাম। 'হঠাৎ একথা কেন, বিল?'

হাঁপাচ্ছে বিল। 'আমার...আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে,

রালফ। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। মৃত্যুর ওপারে যেতে মন চাইছে না...'

'ওসব কথা ভেবো না, বিল। ঈশ্বরকে ডাকো মনে মনে। তিনিই সব ঠিক করে দেবেন।'

'কিন্তু কি করে ডাকবো? জানি না যে! সারা জীবন তো ডাকাতি করেই কাটিয়েছি...'

বাইবেলের ছুটো শ্লোক শিখিয়ে দিলাম তাকে।

শুয়ে পড়লো বিল। চাপা গোঙানি বেরোলো মুখ থেকে। বিড়বিড় করে আওড়ানোর চেষ্টা করছে শ্লোক। ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে।

একপাশের দিগন্তের ওপর চোখ পড়লো হঠাৎ। ফুলে উঠেছে ওখানকার সাগর। শিগগিরই কানে এলো চাপা একটা হিসহিস। বাতাসের গতি বেড়ে গেছে অনেক। জলোচ্ছ্বাস আসছে না-তো!

হাল ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেলাম মাস্তুলের কাছে। দ্রুত হাতে নামিয়ে ফেললাম চূড়ার কাছের পাল। ফিরে এসে হাল ধরতে না ধরতেই এসে গেল জলোচ্ছ্বাস।

ভয়ানক ঝাঁকুনি খেলো জাহাজ, দুলে উঠলো ভীষণভাবে। পানির ছিটায় ভিজে গেল পুরো ডেক। জিনিসপত্র গড়াগড়ি খেতে লাগলো ডেকের এপাশ থেকে ওপাশে। কোনোদিকে নজর দেবার সময় নেই। প্রাণপণে হালের চাকা চেপে ধরে আছি।

কালো হয়ে গেছে আকাশ। কানের পর্দায় আঘাত হানছে বাতাসের তীক্ষ্ণ শিস। ফুঁসছে সাগর। জাহাজটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে বড় বড় ঢেউ।

যেমন এসেছে, তেমনি হঠাৎই চলে গেল আবার জলোচ্ছ্বাস। এদিককার সাগরে এমন কাণ্ড ঘটে প্রায়ই। বিলের দিকে তাকানোর সুযোগ পেলাম।

আরে, নেই তো বিল! কোথায় গেল! রেলিঙ ঘেঁষে শুয়ে আছে বিল। চুপচাপ। থাক, ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই। সাগর এখনো পুরোপুরি শান্ত হয়নি। হালের চাকা ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।

ঘণ্টাখানেক পর শান্ত হয়ে এলো সাগর। আবার সব চুপচাপ। উজ্জ্বল রোদ। পরিষ্কার আকাশ। ঝিরঝিরে বাতাস। সাগর শান্ত।

হাল ছেড়ে গিয়ে বসলাম বিলের পাশে। গভীর ঘুমে অচেতন। নাকি বেহুঁশ হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে এলাম। ছিপি খুলে বোতলের মুখ ঢুকিয়ে দিলাম বিলের মুখে। কিন্তু এক বিন্দু তরল পদার্থ ঢুকলো না ভেতরে, সব গড়িয়ে পড়ে গেল কশ বেয়ে। আরে! হঠাৎ ভয়ানক জোরে এক লাফ দিলো আমার হৃৎপিণ্ড। তাড়াতাড়ি কান রাখলাম বিলের বুকে। না, কোনো শব্দ নেই। মৃত্যু হয়েছে দুর্দান্ত জলদস্যুর।

বিলের মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছি। গলার

কাছে কিসের একটা দলা ঠেলে উঠে আসছে বার বার। ঢোক গিলেও নামাতে পারছি না। চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। পানি আসছে না চোখে। ওই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, কতোখানি ভালোবেসে ফেলেছিলাম ভয়ংকর ওই ডাকাতকে! আমাকেও নিশ্চয় ভালোবেসেছিলো ও নইলে ··

আর ভাবতে পারলাম না। এবার সত্যিই কেঁদে ফেললাম হু-হু করে।

কতোক্ষণ একভাবে বসে থেকেছি, বলতে পারবো না। শক্ত করে নিলাম মনকে। উঠে গিয়ে দড়ি আর কামানের একটা গোলা নিয়ে এলাম। শক্ত করে বাঁধলাম বিলের এক পায়ে। বেজায় ভারি। ওকে তোলা আমার সাধ্যের বাইরে। টেনে নিয়ে এলাম ডেকের পেছনে, যেখানে রেলিঙ নেই। জোরে জোরে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে, বিলের আত্মার মঙ্গলের জন্যে। তারপর ঠেলে ফেলে দিলাম পানিতে। বিলের তলিয়ে যাওয়া দেখতে পারবো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম হালের কাছে।

হপ্তা পেরিয়ে গেছে।

পুব থেকে চমৎকার হাওয়া বইছে একটানা। জাহাজের চূড়ার পাল আবার তুলে দিয়েছি। গতিপথ ঠিক করে রেখেছি আগেই। ঠিকমতোই এগোচ্ছে স্কুনার।

চব্বিশ ঘণ্টার বাইশ ঘণ্টাই জেগে থেকেছি গত সাত দিন।

দু'ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে নিয়েছি, হালের চাকাটা দড়ি দিয়ে একটা হুকের সঙ্গে বেঁধে রেখেছি তখন।

আকাশ পরিষ্কার। সাগর শান্ত। যে হারে এগোচ্ছে, এ-ভাবে চললে আর আট-দশ দিনের মধ্যেই প্রবাল দ্বীপে পৌঁছে যাবার কথা।

আরো এক হপ্তা পেরোলো।

চোদ্দ দিনের দিন, বিকেলে, ঘুম থেকে হঠাৎ চমকে জেগে উঠলাম। মাথার ওপরে কর্কশ একটা চিৎকার। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম, একটা অ্যালব্যাট্রস। ঘুরে ঘুরে চক্কর দিচ্ছে। লক্ষণ শুভই মনে হচ্ছে। খুশি হয়ে উঠলাম।

যতোক্ষণ দিনের আলো থাকলো, আমাকে সঙ্গ দিলো পাখিটা। তারপর উড়ে চলে গেল সামনের দিকে। তার মানে, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। ডাঙার দিকেই গেছে পাখিটা।

সারারাত হালের চাকা ধরে বসে রইলাম।

ভোর হচ্ছে। পুব আকাশে ধূসর আলোর আভাস। ঘুমে ভারি চোখ আমার। দিগন্তের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। এক টুকরো কালো মেঘ! আবার জলোচ্ছ্বাস! তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে চূড়ার পাল নামিয়ে ফেললাম। অপেক্ষা করে রইলাম দুরুদুরু বুকে।

কিন্তু এলো না জলোচ্ছ্বাস। মেঘটা বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। এমন তো হবার কথা নয়! হঠাৎ বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। প্রথমে বুঝতে পারিনি, তার কারণ আমার ঘুমে জড়ানো চোখ।

একটা দ্বীপ।

আরো এগোলো জাহাজ। না, আর কোনো সন্দেহ নেই। সেই পাহাড়চূড়া। দ্বীপ ঘিরে শাদা একটা রেখা—প্রবাল প্রাচীরে ঢেউ আছড়ে পড়ায় দূর থেকে এমন দেখাচ্ছে।

প্রবাল দ্বীপ।

তিরিশ

আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু না, অসাবধান হওয়া চলবে না। তীরে এসে তরী ডুববে তাহলে। শক্ত হাতে হালের চাকা ধরে রইলাম। সহসাই সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে শরীর থেকে।

এখনো কয়েক মাইল দূরে আছে প্রবাল দ্বীপ। দিগন্তের ধূসর পটভূমিতে বড় বড় দুটো পাহাড়ের চূড়া এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আরো ঘণ্টা দুই একনাগাড়ে চললো জাহাজ।

পিটারকিন আর জ্যাকের অভ্যাস জানা আছে আমার। ছ'টার আগে ঘুম ভাঙবে না ওদের। আশা করলাম, তার আগেই পৌঁছে যাবো।

ঠিক করলাম, ফাটল দিয়ে জাহাজ নিয়ে ল্যাগুনে ঢুকে পড়বো। পেছনে আরেকটা নোঙর আছে, ওটা ফেলে জাহাজ থামিয়ে অপেক্ষা করবো বন্ধুদের জেগে ওঠার।

হালের চাকা দড়ি দিয়ে বেঁধে ক্যাপ্টেনের কেবিনে এসে ঢুকলাম। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। পেয়ে গেলাম

'জলি রোজার,' কালো পতাকাটা। প্রধান মাস্তুলের মাথায় তুলে দিলাম জলদস্যুদের চিহ্ন। পর মুহূর্তেই মনে পড়লো কথাটা। ঠিক। তাই করবো।

বারুদের বাক্স খুললাম। ঠেসে বারুদ ভরলাম কামানে। গোলা ছাড়াই। পলতে লাগিয়ে তৈরি করে রাখলাম কামানটাকে।

প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। আর সিকি মাইলটাক দূরে আছে প্রবাল প্রাচীর। চোখের পলকে যেন পেরিয়ে এলাম ওটুকু দূরত্ব। ফাটলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিলাম জাহাজের। হুঁশিয়ার রইলাম, প্রাচীরের গায়ে যেন ঘষা না লাগে।

নিরাপদেই ঢুকে পড়লাম ল্যাগুনে। নোঙর ফেললাম। এবার অপেক্ষা।

সূর্য উঠলো। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এলো যেন সোনালি আলোর বর্শা। বনভূমি, পাহাড়, সাগরের বুকে বিঁধে গেল যেন। উঠে গিয়ে পলতেয় আগুন লাগিয়ে দিলাম।

বু-ম্-ম্-ম্ করে গর্জে উঠলো কামান। মাস্তুলের মাথায় পত পত করে উড়ছে জলি রোজার। তীরের দিকে চেয়ে আছি।

কামানের শব্দ মিলাতে না মিলাতেই দেখলাম পিটারকিনকে, কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে দেখতে পেলো না সে। বড় বড় চোখে তাকালো একবার জাহাজটার দিকে। তারপরই আতংকিত চিৎকার করে

ছুটে চলে গেল ঝোপের ভেতর।

পর মুহূর্তেই বেরিয়ে এলো জ্যাক। এক নজর দেখলো জাহাজটাকে। অনুসরণ করলো পিটারকিনকে।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলাম মাস্তুলের আড়াল থেকে। চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'এই যে, ধিচ্ছুরা! যেও না, দাঁড়াও! আমি ক্যাপ্টেন রোভার!'

ঝোপে ঢুকে পড়েছিলো প্রায় জ্যাক, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘুরলো ধীরে ধীরে। তার পাশেই বেরিয়ে এলো পিটারকিন। দুজনেই তাকিয়ে আছে ডেকের দিকে।

খোলা জায়গায় এসে হাত তুললাম। চেঁচিয়ে ডাকলাম বন্ধুদের। তারপরই রেলিঙ টপকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে।

দড়াম করে আমার বুকে এসে বাড়ি লাগলো জ্যাকের বুক। এক পাশ থেকে দুজনকেই জড়িয়ে ধরলো পিটারকিন। সেই অবস্থায়ই লাফাতে শুরু করলাম তিনজনে।

টেনে গল্প লম্বা করার কোনো মানে হয় না। এরপর খুব সংক্ষেপে সারছি।

আমি কি করে দস্যুদের হাতে ধরা পড়লাম, জানালাম দুই বন্ধুকে। কি করে জাহাজ নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছি খুলে বললাম।

তারপর ওদের কথা জানাতে বললাম।

'তুমি চলে যাওয়ার পর আরো এক ঘণ্টা হীরক-গুহায়

অপেক্ষা করলাম,' বললো জ্যাক। 'উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। শেষে আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে। কোথাও তোমার কোনো চিহ্ন দেখলাম না। দূরে দেখলাম, স্কুনারটা চলে যাচ্ছে। তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে ডাকাতেরা, বুঝতে অসুবিধে হলো না। ফিরে গিয়ে সব জানালাম পিটারকিনকে। কাঁদতে শুরু করলো ও। অনেক কষ্টে থামিয়েছি ওকে। তোমার জন্যে কিছুই করার ছিলো না আমাদের। এরপর, পিটারকিনকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।'

'ওকে বের করলে কি করে?' জানতে চাইলাম।

'সে এক মজার ব্যাপার,' হাসলো জ্যাক। 'লম্বা একটা লাঠি নিয়ে এক মাথা শক্ত করে ধরে রাখতে বললাম পিটারকিনকে। অন্য মাথা ধরে সাঁতরে তাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবো। লাঠি ধরলো সে। দম নিলো। ওর অবস্থা যদি দেখতে তখন! হেসে গড়াগড়ি খেতে। পেটটাকে এমন ফোলান ফোলালো, সেই ব্যাঙের অবস্থা হয়ে যাচ্ছিলো আরেকটু হলে...'

'কোন্ ব্যাঙ?'

'আরে সেই যে, সেই গল্পের ব্যাঙ। এক ষাঁড়কে দেখে তার পেটের সমান পেট ফোলাতে চেয়েছিলো এক বোকা ব্যাঙ। তারপর পেট ফেটে গিয়ে মরে গেল...'

জ্যাকের দিকে কিল তুললো পিটারকিন।

হাসলাম তিনজনেই।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তারপর আর কি ? লাঠির মাথা ধরে টেনে বের করে আনলাম সাঁতার-না-জানা এক কোলা ব্যাঙকে,' থামলো একটু জ্যাক। তারপর বললো, 'পুরো দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি তোমাকে, রালফ, অযথাই !'

আরো অনেক কথাবার্তা হলো তিন বন্ধুতে। অবশেষে ঠিক করলাম আমরা, আর এ-দ্বীপে নয়। আবার কোন্‌দিন এসে হাজির হবে মানুষখেকোরা, কে জানে ! আরেকটা জলদস্যুর জাহাজ এসে হাজির হলেও অবাক হবার কিছু নেই। তার চেয়ে, কপালগুণে জাহাজ যখন একটা পেয়েই গিয়েছি, দেশে ফিরে যাওয়া ভালো। তিনজনেই নাবিক আমরা। সহজেই কাছাকাছি কোনো নিরাপদ বন্দরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো স্কুনারটা। ওখান থেকে দেশের জাহাজ ধরতে পারবো।

পরদিন, পুরো দ্বীপটায় ঘুরে বেড়ালাম আমরা। সব ক'টা প্রিয় জায়গা দেখে এলাম শেষবারের মতো।

উঁচু পাহাড়টার মাথায় চড়ে নিচের সুন্দর দৃশ্য দেখলাম : উপত্যকা, সবুজ বন, রূপালি সৈকত, নীল ল্যাগুন, রঙিন প্রবাল প্রাচীরের দিকে চেয়ে ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের ভেতরটা। কেমন এক ধরনের অব্যক্ত যন্ত্রণা। প্রাচীরের ওপাশে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দিকে চেয়ে কেমন উদাস হয়ে গেল মনটা। ক্ষণিকের জন্যে ভেবে বসলাম, আরো কিছুদিন থেকেই যাই না কেন এখানে ! তাড়াতাড়ি গলা টিপে মারলাম

ইচ্ছেটাকে।

হীরক-গুহার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে এলাম আমি আর জ্যাক, শেষবারের মতো। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম 'লেজ নাড়তে-থাকা-সবুজ-প্রাণীটার' দিকে। শেষ বারের মতো গিয়ে দেখে এলাম ছাতার মতো গাছটার তলায় শুয়োরের পালকে।

জলজ বাগানে এসে অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করলাম আমি আর জ্যাক। অ্যাকোয়ারিয়ামের সবগুলো প্রাণীকে আবার সাগরে ছেড়ে দিলাম আমি। তারপর ফিরে এলাম জাহাজ উপ-ত্যকায়, কুঁড়েতে।

ছোটো একটা কাঠের বোর্ড বানিয়ে নিলো জ্যাক। তার ওপর নাম খোদাই করলো :

জ্যাক মার্টিন

রালফ রোভার

পিটারকিন গে

বোর্ডটা কুঁড়ের ভেতর ঝুলিয়ে দিলাম।

নৌকা নিয়ে এসে উঠলাম জাহাজে। ভোরালো হাওয়া বইছে। সূর্য ডোবার আগেই ল্যাগুন থেকে বেরিয়ে খোলা সাগরে পড়লো স্কুনার। পাল তুলে দিলাম।

ছুটে চলেছে জাহাজ। সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের অগাধ জলরাশি। পেছনে যতোক্ষণ দেখা গেল, চেয়ে রইলাম দ্বীপের দিকে।

দিগন্তে হারিয়ে গেল দ্বীপ। এক সময় টুপ করে সাগরে ডুবে গেল যেন পাহাড়ের চূড়াটা।

অপূর্ব একটা সুখস্বপ্নের মতো চিরদিনের জন্যেই হারিয়ে গেল আমাদের প্রবাল দ্বীপ।

—: শেষ :—